শুকতারা

ঊনত্রিংশ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ় • ১৩৮৩

সর্পরাজের দ্বীপে

দুজনে তাদের ব্লো-পাইপ আর শক্তিশালী ছুঁচের মতো বর্শা নিয়ে ঘুমন্ত বা জেগে থাকা সমস্ত মাঝি মাল্লার ওপর আক্রমণ চালিয়ে গেলো···

ওষুধটা দারুণ! প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সামান্যে আদেশও পালনে বাধ্য হয়। বললে বোধ হয় সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে!

ঠিক! জাহাজের প্রত্যেক লোকটাই এখন আমাদের দাস!

বাজে রসিকতা করার সময় নেই। বেতার ঘরে গিয়ে এই খবরটা পাঠিয়ে দাও!

বেতার ঘরে···

আমি কিছু খবর পাঠাবো। তুমি এখান থেকে সরে যাও!

আপনি যা বলবেন তাই হবে স্যার!

লোকটি তার নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে যোগাযোগ করলো···

সব ঠিক প্রভু! জাহাজ এখন আমাদের দখলে!

চমৎকার আমি বো পাঠাচ্ছি!

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই কালো ছায়ার মতো দুটো বড়ো জলযানকে পুরোণো জাহাজটার দিকে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো···

আমাদের বন্ধুরা আসছেন! আপনারা আপনাদের ঐ—ইয়ে—ব্যাঙের মাংসের বাক্সগুলো ঐ বোটে সরাতে আশা করি আমাদের সাহায্য করবেন!

নিশ্চয় আমরা আপনাদের সাহায্য

Hard Copy - Sanghamitra Sarkar & Shankha Majumder
Scan - Sanghamitra Sarkar & Rajashree Dhar
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

খেতে ভাল দেখতে ভাল ভাবতে ভাল

পার্লে পপিন্স

মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/393/PP-bn

বাঁটুল দি গ্রেট

চল, বাঁটলো আসার আগে আমরা ওর পাঠশালায় গিয়ে ওকে ঘায়েল করার জন্যে ফাঁদ রেখে আসি!
ঠকাং!
ঠকাস!
এই যে, ভালো আছিস তো? যাতে আগে এসে আমাকে বেকায়দায় ফেলার কারসাজী না করতে পারিস সেজন্যে কাল রাত্রে আমি পাঠশালায় তালা এঁটে রেখে গেছি!
বৎসযুগল, বাড়ির কাজের খাতা বের করো। দেখে ঠিক করে দি!
নিশ্চয় বের করবো বাঁটুলদা!
এই যে আমি দিয়ে দিলুম। তবে হাতের বদলে নাক দিয়ে ধরো!
আমি ডেস্কের ঢাকনায় রবারের ফেনার গদী লাগিয়ে রেখেছি! তাই ছুঁড়ে দেওয়া খাতা এবার তোদের মাথা ভাগ করে ছুটে যাচ্ছে!
পোয়াং!
পোয়াং!
ওঁকস্! উল্টে আমাদেরই নাক যে ঢাক হয়ে গেলো রে!
ওফ্!
চপাক!
ফটাং!
মনে হচ্ছে চকের বাক্সটা এই দেয়াল-আলমারিতে রেখেছি!
একি!
হোঃ-হোঃ! পরশু আমরা আলমারির তলায় গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলুম।

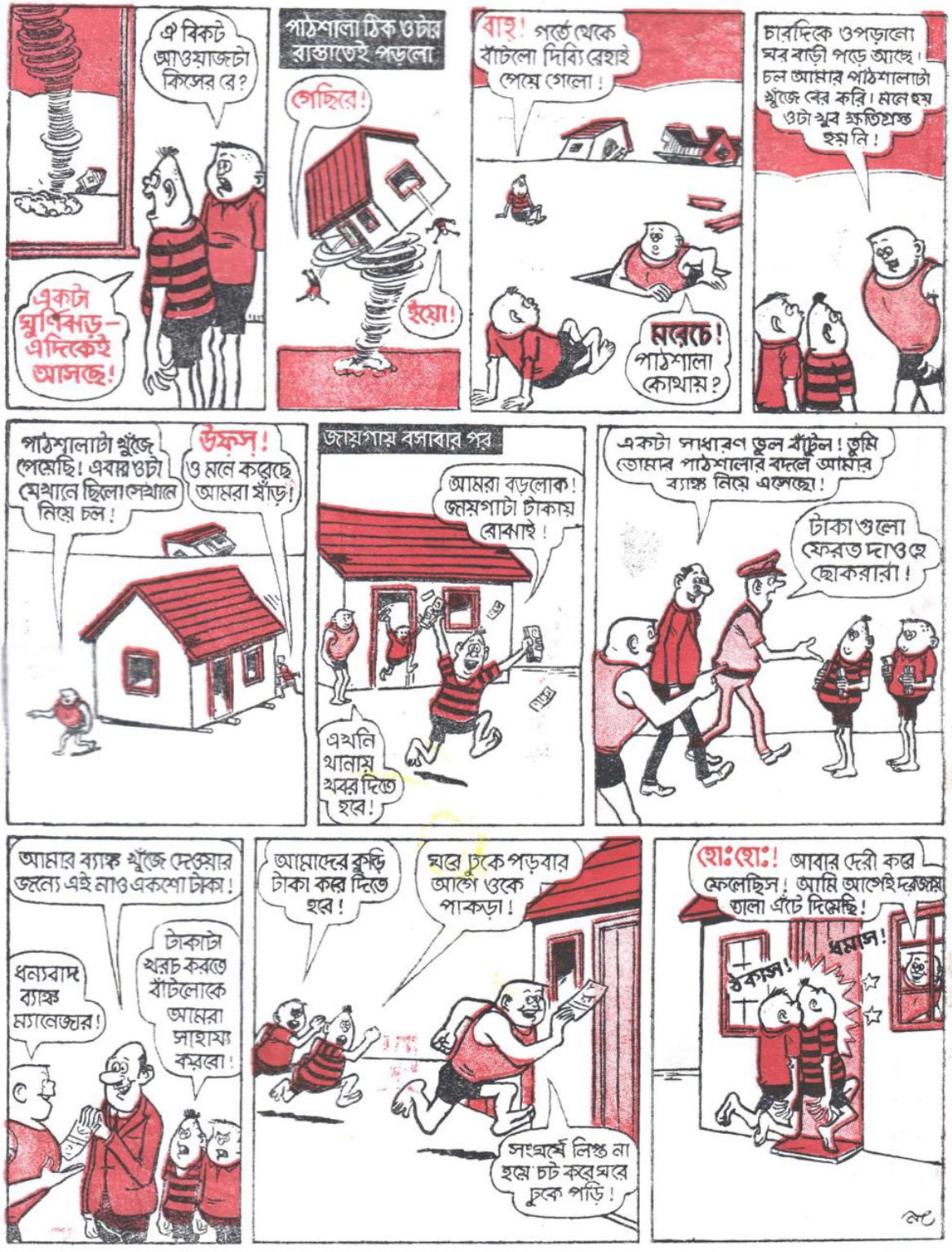
ঐ বিকট আওয়াজটা কিসের রে?
একটা ঘূর্ণিঝড়– এদিকেই আসছে!
পাঠশালা ঠিক ওটার রাস্তাতেই পড়লো
গেছিরে!
ইয়ো!
বাহ্! গর্ত থেকে বাঁটলো দিব্যি রেহাই পেয়ে গেলো!
মরেচে! পাঠশালা কোথায়?
চারদিকে ওপড়ালো ঘর বাড়ী পড়ে আছে। চল আমার পাঠশালাটা খুঁজে বের করি। মনে হয় ওটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি!
পাঠশালাটা খুঁজে পেয়েছি! এবার ওটা যেখানে ছিলো সেখানে নিয়ে চল!
উফস্! ও মনে করেছে আমরা ষাঁড়!
জায়গায় বসাবার পর
আমরা বড়লোক! জায়গাটা টাকায় কেনা!
এখনি থানায় খবর দিতে হবে!
একটা সাধারণ ভুল বাঁটুল! তুমি তোমার পাঠশালার বদলে আমার ব্যাঙ্ক নিয়ে এসেছো!
টাকা গুলো ফেরত দাও হে ছোকরারা!
আমার ব্যাঙ্ক খুঁজে দেওয়ার জন্যে এই নাও একশো টাকা!
ধন্যবাদ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার!
টাকাটা খরচ করতে বাঁটলোকে আমরা সাহায্য করবো!
আমাদের বুদ্ধি টাকা করে দিতে হবে!
ঘরে ঢুকে পড়বার আগে ওকে পাকড়া!
সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ি!
হাঃহাঃ! আবার দেরী করে ফেলেছিস! আমি আগেই দরজায় তালা এঁটে দিয়েছি!
ধমাস!
ধমাস!

শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৮৩

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্পরাজের দ্বীপে (সচিত্র চিত্র-কাহিনী)	—নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	তিন জনা (কবিতা)	—বেণু গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩২৩
৪।	নকুল মামা (গল্প)	—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ...	৩২৪
৫।	শেয়াল মামার কাহিনী (গল্প)	—বীরু চট্টোপাধ্যায় ...	৩২৯
৬।	আঙ্গুল যাদের ছয়টা (বৈজ্ঞানিক গল্প)	—শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৩৩৩
৭।	ভুলুয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য (অমর বীর কাহিনী)	—শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৩৪০
৮।	জর্জ স্টিফেনসন (জানবার কথা)		৩৪৬
৯।	টাটকা গরম (কবিতা)	—হাসিরাশি দেবী ...	৩৪৭
১০।	যুগে যুগে (ছবিতে গল্প)	—দিলীপ দাস ...	৩৪৮
১১।	গেল সে চাঁদের রাজ্যে (গল্প)	—বন্দে আলী মিয়া ...	৩৫০
১২।	ফাঁড়া (কবিতা)	—অনিরুদ্ধ সিংহরায়	৩৫৩
১৩।	অপরাজেয় টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	—সব্যসাচী ...	৩৫৪
১৪।	অবিস্মরণীয় মণিমুক্তা (জীবন-কথা)	—রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬০
১৫।	বীর ছেলে বাংলার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৩৬১
১৬।	বৃহত্তম গ্রহ (জানবার কথা) ...		৩৬৭
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার গোল্লা পর্ব (ছবিতে গল্প)		৩৬৮
১৮।	হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে (বিদেশী গল্প)	—দিনকর শর্মা	৩৭০
১৯।	বল ত সাপটা কি দেখে ভয় পেয়েছে ? (মজার ছবি) ...		৩৭৬
২০।	ভূতের গল্প (গল্প)	—পূরবী দেবী	৩৭৭
২১।	বাগারু মামার বুদ্ধি (গল্প)	—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৩৮০
২২।	প্রতিশোধ (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—নন্দিনী মণ্ডল ...	৩৮৬
২৩।	"৺বুলবুল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...		৩৮৮
২৪।	সুনন্ত এবং আমি (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—সুতপা গুপ্তা ...	৩৮৯
২৫।	চুলের কার্পেট (জানবার কথা)		৩৯১
২৬।	ছাত্রবন্ধু বিদ্যাসাগর (জীবন কথা)	প্রণবকুমার পাল ...	৩৯২
২৭।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...		৩৯৪
২৮।	আনন্দ আর ধরে না (খেলাধুলা)	—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯৬

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য টা. ১·২৫

ছোটোরা যখন ছোটো থাকে...

তখন তো তাদের দুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা স্বভাবতই শান্ত তারাও তো কখনো সখনো দুরন্তপনা করে। খেলতে গিয়ে অন্য সবায়ের মতো তারাও হাত-পা কেটে ফেলে। শরীরের নানা জায়গা তাদেরও ছড়ে যায়। ঘষা লাগে।

এইসব কাটা-ছেঁড়া-ফাটা-ঘষালাগা জায়গাগুলো দূষিত হ'য়ে উঠতে কী খুব সময় লাগবে! কারণ ধুলো-বালির নোংরা ধুলেও সহজে যায় না। তাই **বোরোলীন** হাতের কাছে রাখতে পরামর্শ দেওয়া।

বোরোলীন

ব্যবহারের অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গ'ড়ে তোলা ভালো। দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই জানতে হবে, ছোটোবেলার দুষ্টুমির চিহ্নগুলো যাতে দূষিত না হ'য়ে ওঠে, যাতে ত্বক সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও মালিন্যমুক্ত থাকে তারজন্য সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম **বোরোলীন**

ব্যবহার করাই নিরাপদ।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
বোরোলীন হাউস, ৯ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

ঊনত্রিংশ বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● ১৩৮৩, আষাঢ়

তিন জনা

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ বছরের পান্না
করতে গিয়ে রান্না
লঙ্কা লাগায় দু'টো চোখেই
তাই জুড়েছে কান্না।

পান্নার বোন মিন্নি
যেন পাকা গিন্নি
ধুলোর জলে গুলে বানায়
সত্যপীরের সিন্নি।

সব ছোট বোন আন্না
তিনিও তো কম যান না
বায়না ধরেন সাত সতেরো
তা না পেলেই কান্না।

ওদের কাজের ধূম কি!
দাদাকে বলে "লাল কালিটায়
হবে না কুমকুম কি?
রাংতা কেটে বসিয়ে দেব
তোমার গায়ে চুমকি?"

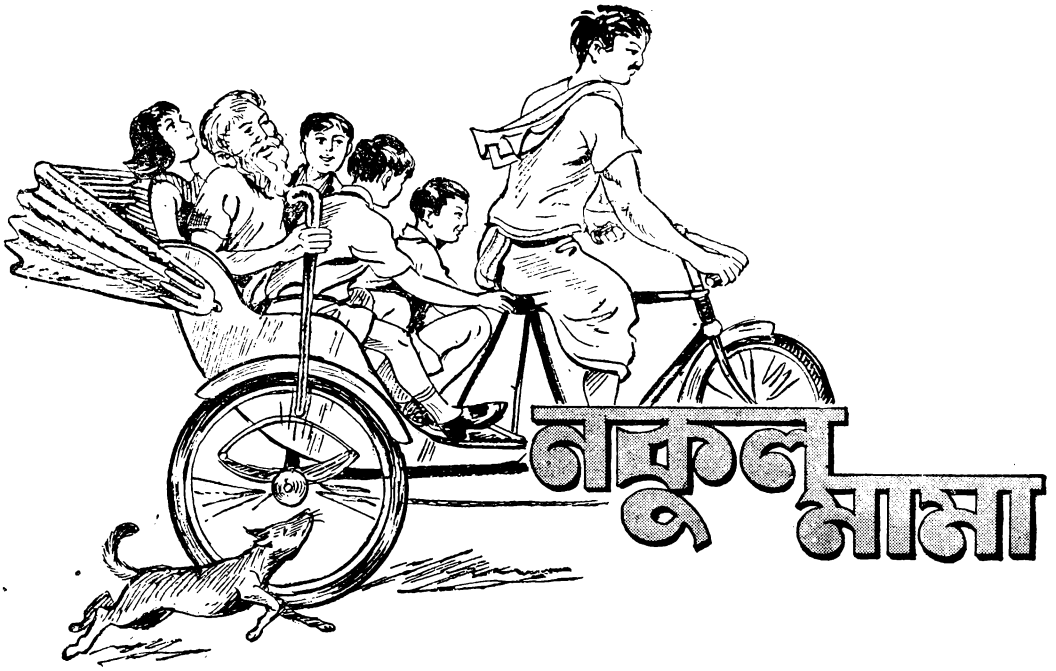

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ক'দিন থেকেই বাড়িতে খুব হইচই চলছে। কলকাতা থেকে নকুলমামা আসবেন। ঘরদোর গোছানো হচ্ছে দু'বেলা। বাড়িতে এক দঙ্গল দস্যি ছেলেমেয়ে কি না। সব সময় এটা ভাঙ্গে, ওটা ফেলে। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তর সয় না। তক্ষুণি দুমদাম লাফালাফিতে সব ছত্রখান হয়ে যায়। কিন্তু যে সে নয়, নকুলমামা আসছেন! অতএব এ সব দস্যিপনা কমেছে কিছুটা। পইপই করে বলা হয়েছে—সাবধান, উনি হইচই একেবারে পছন্দ করেন না।

কিন্তু কে এই নকুলমামা? পিণ্টু সবার বড়ো। কিন্তু সেও কোনদিন দেখেনি ওঁকে। জ্যাঠার মেয়ে মিনুও দেখেনি। তবে ওঁর সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোন মিলে বাড়িতে সাতটা ছেলেমেয়ে। মিনু তাদের নকুলমামার অনেক অদ্ভুত গল্প শোনাল।

নকুলমামা পিণ্টুর মায়ের দূরসম্পর্কের দাদা হন। চাকরি করতেন আসামের জঙ্গলে অর্থাৎ ফরেস্ট অফিসার। কাজেই দুর্দান্ত শিকারী। বাঘ ভালুক হাতি বিস্তর মেরেছেন। একবার নাকি জংলীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। জংলীরা সভ্য মানুষ দেখলে আগুনে ঝলসে খায়। তাই নকুলমামাকে যখন ওরা আগুনে ঝলসাতে যাচ্ছে, কোত্থেকে এল এক নাগা সন্ন্যেসী। প্রাণে বাঁচাল ওঁকে। তারপর কী যে হল, নকুলমামাও সন্ন্যেসী হয়ে গেলেন!

গেলেন তো গেলেন। বারো বছর আর পাত্তা নেই। আত্মীয়স্বজন ভাবল, আর তবে সংসারে ফিরছেন না! কিন্তু তাঁদের আশায় ছাই দিয়ে একদিন নকুলমামার আবির্ভাব ঘটল। কলকাতার পৈতৃক বাড়িটা যারা ভোগদখল করছিল, তারা অচেনা লোক বলে প্রথমে তো পাত্তাই দেয়নি। শেষে এই লিটনগঞ্জ থেকে পিণ্টুর বাবা আর মা গিয়ে ওঁকে চিনতে পারেন।

নকুলমামা তারপর থেকে কলকাতায় আছেন। সন্ন্যেসীদের নিয়ম কানুন সবই ছেড়েছেন, শুধু চেহারাটি বজায় রেখেছেন। সেই লম্বা চুল, দাড়ি আর গোঁফ—রোগা ঢ্যাঙা গড়ন। পরনে অবশ্যি

আজকাল গেরুয়ার বদলে সাদা থানের ধুতি, ফতুয়া আর পায়ে চটি পরেন। হাতে একটা বেঁটে মোটা লাঠিও থাকে। লাঠির মাথায় পেতলের ক্যাপ। ওই লাঠিটা নাকি সেই নাগা সন্ন্যেসী দিয়েছিল। লাঠিটার তাই অনেক অদ্ভুত গুণ আছে। এই যদি রাখলেন ঘরের কোণে, তো একটু পরেই দেখা যাবে সেটা বিছানায় গিয়ে শুয়ে আছে। বারান্দায় রাখলেন তো পরে পাওয়া গেল বাগানে ফুলগাছের মাথায় গিয়ে চড়ে বসেছে।

—নকুলমামার চেয়ে ওই লাঠিটাই তাহলে ইণ্টারেস্টিং। পিণ্টু বলেছে।

মিনু বলেছে—লাঠিটা নিশ্চয় সঙ্গে আনবেন নকুলমামা!

মিতুন বলেছে—যদি না আনেন, তাহলে আমরা ওঁর সঙ্গে কথাই বলব না!

বুবন গম্ভীর ছেলে। সে গম্ভীরমুখে মন্তব্য করেছে—নকুলমামার সঙ্গে অভদ্রতা করা ঠিক নয়।

এইসব কল্পনা-জল্পনা করতে করতে নকুলমামার আসার দিনটা এসে গেল। সেদিন রোববার। বাড়ির ছেলেমেয়েদের খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছে। সবাই স্টেশনে গিয়ে নকুলমামাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে! সবাই ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরছে। এমন সময় খবর এল পিণ্টুর ঠাকুর্দা রাত্তির থেকে ভীষণ অসুস্থ। উনি থাকতেন নদীর ওপারে পল্টনগঞ্জে। নদীটার দু'পারেই দুটো ছোট্ট শহর। এপারে লিটনগঞ্জ, ওপারে পল্টনগঞ্জ। পল্টনগঞ্জে পিণ্টু আর মিনুর ঠাকুর্দা থাকেন মেয়ের কাছে। কখনও এপারে ছেলেদের কাছেও কাটিয়ে যান। তা সাতসকালে এই খবর পেয়েই পিণ্টুর বাবা, জ্যাঠা, মা, জ্যাঠাইমা অর্থাৎ বাড়ির বড়রা তক্ষুণি রিকশা করে ছুটলেন। বলে গেলেন—নকুলবাবুকে আনতে তোরা স্টেশনে কেউ-কেউ যাস। খাবার-দাবার সব রেডি করা আছে। ঠাকুরকে বলা রইল, ম্যানেজ করে দেবে। আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। দেখবি, ওঁর যেন কোন অসুবিধে না হয়। খুব রাগী মানুষ কিন্তু!

পিণ্টুরা একটু নিরাশ হল বইকি। এমন দিনে কী গণ্ডগোল বাধালেন ঠাকুর্দা! কোন মানে হয় না।

বুবন বলল—মরুক গে। বুড়োরা তো মরবেই। ওদের তো বাঁচার কথা নয়। চল পিণ্টুদা, আমরা স্টেশনে যাই।

পিণ্টু বলল—কিন্তু ওঁকে চিনব কী করে? শুনেছি, মাঝে মাঝে উনি এমন রেগে যান যে···

বাধা দিয়ে মিনু বলল—চেনার ভার আমার। যে ভারি একটা স্টেশন, পাঁচ সাতটা তো লোক নামবে। দেখবি ঠিক চিনে নেব।

পিণ্টু বলল—তাহলে কে কে যাচ্ছে, ঠিক করা যাক।

মিনু সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। সবাই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মিনুদির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। প্রত্যেকেরই যে যাবার ইচ্ছে। বাবলু করুণ মুখে বলে উঠল—লটারি করো না মিনুদি!

বুবন মুখ ভেংচে বলল—লটারি না হাতি! তোর যাওয়া বারণ। তোর কাল জ্বর হয়েছিল না?

মিনু বলল—ঠিক আছে। পণ্টু, বুবন, টিটো আর আমি যাব। তোরা সব দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবি।

টিটো বলল—মিনুদি, মালা লাগবে না?

পিণ্টু বলল—তাই তো! মালা!

মিনু বলল—ঠিক আছে। ইতি, শম্পা, বাবলু! তোরা মালা রেডি কর। এসে যেন দেখতে পাই ঠিকঠাক। মায়ের কৌটোতে সূচ সুতো আছে। সাবধান!

একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে এরা হইচই

করে উঠল। ওরা চারজনে স্টেশনের দিকে এগোল।

কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনটা আসতে বড্ড বেশি দেরি করল যেন। যখন এল, তখন পিণ্টুদের বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল যেন। সেই প্রখ্যাত নকুলমামা আসছেন, যাঁকে জংলীরা আগুনে ঝলসে খেতে চেয়েছিল! যাঁর হাতে নাগা সন্ন্যেসীর অদ্ভুত লাঠি আছে!

কিছু তেমন লোক তো একজনও গেটের দিকে দেখা যাচ্ছে না! ভিড়টা আছে, কিন্তু এমন বেশী ভিড় নয় যে উনি চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন।

একে একে সবাই চলে গেল। ট্রেনটা তার আগেই স্টেশন ছেড়েছে। দূরে বাঁকের মুখে তার ধকধকানি মিলিয়ে যাচ্ছে। প্লাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। পিণ্টু হতাশ হয়ে বলে উঠল—ধুর!

মিনু ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল। বুবন বলল—নকুলমামা না হাতি! আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনে! সব আজগুবি! ইঃ! লাঠি আছে না হাতি!

বোঝা গেল, ওর আগ্রহ সেই অলৌকিক লাঠির দিকেই ছিল। টিটো একটু চঞ্চল ছেলে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সে। হঠাৎ বলে উঠল—দিদি! দিদি! ওই লোকটা নয় তো?

এরা চমকে উঠে তাকাল। রেললাইনের ওপারে একটা গুদামঘর আছে। ওদিকের প্লাটফর্মে শুধু মাল খালাস হয়। যাত্রী নামে না। তার ওধারে ধু-ধু মাঠ। দূরে ছোটখাট পাহাড়।

মিনু বলল—গোঁফ দাড়ি, লম্বা চুল, সাদা ফতুয়া, ধুতি, হাতে লাঠি। সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। ঢ্যাঙা, রোগা—তাও মিলছে। কিন্তু ওখানে উনি কী করছেন?

পিণ্টু বলল—কিন্তু ওদিকে নামবেন কেন নকুলমামা? ওদিকে তো নামে যারা টিকিট কাটে না, তারাই!

বুবন বলল—নকুলমামাও হয়তো টিকিট কাটেনি! মানে, কাটবার সময় পাননি! ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিল তাই—

বাধা দিয়ে মিনু বলল—তোর সবটাতেই পণ্ডিতি! টিকিট না কাটা হলে গার্ডকে বললেই হত। এখানে নেমে স্টেশন মাস্টারকেও বলা যেত!

বুবন তক্ষুণি বুঝতে পেরে বলল—ঠিক, ঠিক। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, উনি নকুলমামা নন।

মিনু তাকিয়ে রইল। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। লোকটা গুদামঘরের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে। তারপর সে লাইন ডিঙিয়ে এপারে স্টেশনের পাশের পীচরাস্তায় চলে এল। তখন মিনু বলল—ব্যাপারটা অদ্ভুত তো! আয় তোরা। বরং মুখোমুখি জিজ্ঞেস করি।

পিণ্টু বলল—অদ্ভুত তো হবেই। নকুলমামার নাকি সবই অদ্ভুত। তুইই তো বলিস।

চারজনে প্রায় দৌড়ে চলল। পীচের রাস্তায় রিকশার ভিড় অনেকটা কম এখন। বাসটাও চলে গেছে। লোকটা একটা পিপুল গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশে চায়ের দোকান আছে। সে পা বাড়াতেই মনে হল, কোন দোকানে চা খেতে ঢুকবে। যদি নকুলবাবু হন, এ ব্যাপারটাও অদ্ভুত বলতে হয়। কোন ভাগ্নে-ভাগ্নীদের বাড়ি চা না খেয়ে বাইরে পয়সা দিয়ে চা খাবেন, এটা হয়তো ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু ভাগ্নে-ভাগ্নীদের পক্ষে অদ্ভুত বইকি। মিনু ফিসফিস করে বলল—নকুলমামা ছাড়া আর কেউই নয়। সেন্ট পারসেন্ট নকুলমামা। আয় তোরা।

চারজনে গিয়ে সামনাসামনি দাঁড়াতেই লোকটা কাঁচুমাচু মুখে হাসল।

মিনু বলল—আপনি নকুলমামা না?

লোকটা তেমনি কাঁচুমাচু হেসে কী বলতে যাচ্ছিল, পিণ্টু এক লাফে সামনে এগিয়ে একগাল হেসে বলল—আলবৎ আপনি নকুলমামা! কী কাণ্ড! আমরা কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে ওয়েট করছি! বুবন, রিকশা ডাক্!

মিনু বলল—আপনার কতসব গল্প শুনেছি! জানেন, ক'দিন থেকে বাড়িতে কারও চোখে ঘুম নেই আপনি আসবেন বলে! ইস, আগে প্রণাম করি।

বলে সে তক্ষুণি পায়ের ধুলো নিল। দেখাদেখি পিণ্টু, টিটো। বুবন রিকশা ডাকছিল। ঘুরে ব্যাপারটা দেখে সেও লাফিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল এবং চুপিচুপি লাঠিটা একবার ছুঁয়েও দেখল। তার গা শিউরে উঠল।

নকুলবাবুর মুখ থেকে কাঁচুমাচু ভাবটা যাচ্ছে না। বিব্রত মুখে কী বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এরা বলতে দিলে তো! মিনু হইচই করে ঠাকুর্দার অসুখের খবর শোনাচ্ছে। তারপর রিকশা আসতেই সবাই একরকম জোর করে ওঁকে তুলে দিল। একই রিকশায় চেপে বসল এ ওর কাঁধে। রিকশাওলা ব্যাজার হয়ে প্যাডেলে চাপ দিল। মাঝখানে নকুলমামা বসে আছেন—মুখে অপ্রস্তুত হাসি।...

মালা নিয়ে ইতিরা তৈরিই ছিল। শুধু মাইকটাইক বা শাঁখই যা বাজল না। খাটের ওপর নকুলমামাকে বসিয়েছে ওরা। মিনু কিচেন থেকে নিজের হাতে খাবারের প্লেট বয়ে আনছে। নকুলমামা শুধু কেমন হাসছেন। আর খাচ্ছেনও। সন্দেশ রসগোল্লা পায়েস ফুলকো লুচি ফল-টল—যা আসছে গোগ্রাসে খাচ্ছেন। খাওয়া দেখে বুবন চুপিচুপি বলল—ওঁর সবই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

এবার গল্প চাই। পিণ্টু বলল—ফরেস্ট

—তুই!! বিভূতি না? তুই এখানে কী করছিস? [পৃষ্ঠা ৩২৮

অফিসে থাকার সময় জংলীদের হাতে পড়ার গল্পটা বলুন মামা! এই! তোরা সাইলেন্স!

নকুলমামা বললেন—তা ইয়ে। ফরেস্ট মানেই তো জঙ্গল। জংলীরাও থাকে।

মিনু বলল—না, না মামা! ডিটেলস বলুন।

বুবন বলল—না মামা। আপনার এই লাঠির ব্যাপারটা বলুন।

লাঠিটা উনি কোলেই রেখেছেন। রাখবেন বইকি! অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লাঠি কি হাতছাড়া করলে চলে? টিটো বলল—হ্যাঁ মামা! লাঠির গল্প বলুন!

পিণ্টু বলল—কিন্তু...আপনার লাঠির মাথায় সেই পেতলের সাপ কোথায় মামা?

সবার এতক্ষণে ঠাহর হল, লাঠির মাথাটা খালি। বুবন বলল—ভেরি ইণ্টারেস্টিং! মামা, সাপটা কোথায় গেল?

ইতি হঠাৎ বলল—মামা, অত ময়লা কাপড়-চোপড় পরেছেন কেন ?

নান্তু বলল—ইস ! কত সেলাই আপনার জামাটাতে। কেন মামা ?

পোশাকের দিকেও এতক্ষণে সবার চোখ পড়ল। ময়লা ছেঁড়াখোড়া জামাকাপড় পরে আছেন নকুলমামা। বুবন ব্যাপারটা দেখার পর চুপিচুপি মন্তব্য করল—নকুলমামার সবই তো অদ্ভুত !

হ্যাঁ, অদ্ভুত আগাগোড়াই। শুনেছিল, কলকাতায় বিরাট বাড়ি আছে ! পয়সাকড়ির অভাব নেই ওঁর। তবে অমন মানুষের পক্ষে এ-রকমটা স্বাভাবিক বই কি। অত বছর সাধুসঙ্গ করেছেন, পোশাক-আশাকের প্রতি অত চোখ থাকবে কেন ?

শেষে আবার গল্প শোনার ঝোঁকটা বেড়ে গেল। শিকারের গল্প, জংলীদের গল্প, নাগাসন্ন্যাসীর গল্প। কিন্তু নকুলবাবু একটু কেসে বললেন—সব রাত্তিরে বলব। এখন বলি অন্য গল্প।

বলেই উনি জানলার বাইরে একবার তাকালেন। তারপর নড়ে উঠলেন। পা বাড়িয়ে নামতে যাচ্ছেন খাট থেকে। দেখেই হইহই করে সবাই। ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ঘিরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। —না, না। গল্প না বলে রেহাই নেইই। কতদিন ধরে প্রতীক্ষা ছিল।

বিপন্নমুখে নকুলবাবু দাড়ি চুলকে বললেন—তবে বলি। এক ছিল রাজা। তার ছিল মস্ত এক রাজ্য।

এমন সময় দরজায় হেঁড়ে গলায় কে ডেকে বলল—কই রে রাজু ! বিকাশভায়া কোথায় ?

সবাই ঘুরে থ। ইনিও সন্ন্যেসীমার্কা মানুষ। মাথায় লম্বা চুল, মুখে লম্বা দাড়ি-গোঁফ, গায়ে সাদা ধবধবে ফতুয়া, পরনে ধুতি—হাতে লাঠিও ঠিক-ঠাক। কাঁধে একটা মস্ত ব্যাগ। ঝকঝকে উজ্জ্বল চেহারা। খাড়া নাক। ভুরু কুঁচকে ভেতরটা দেখতে দেখতে ঢুকে পড়লেন। তারপরই বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—তুই !! বিভূতি না ? তুই এখেনে কী করছিস ? অ্যাঁ ?

খাটের নকুলবাবু কাঁচুমাচু হাসলেন।—এই মানে……

—চো-ওপ্ জোচ্চোর কোথাকার ! ফের জোচ্চুরির মতলবে এখানে ঢুকেছ ? আভি গেট আউট ! নয়তো পুলিসে দেব ! আশ্চর্য তো ! এ বাড়ি ঢুকলি কী সাহসে ?

শুনেই খাট থেকে এক লাফে নেমে উনি দরজা গলিয়ে পালিয়ে গেলেন। নতুন আসা লোকটির অট্টহাসি শোনা গেল।—এই ছেলেমেয়েরা, হাঁ করে কী সব দেখছ ? আমি তোমাদের নকুলমামা ফার্স্ট ট্রেন ফেল করেছিলুম ! বুঝেছ ?

সবাই মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, বুঝেছে !

আসল নকুলমামা যে রাগী মানুষ, তা সত্যি-সত্যি বোঝা যাচ্ছে। তিরিখ্যি মেজাজে বলে উঠলেন—তা হাঁ করে আছ কেন ? মাকে বলো, আমি এসেছি। আর শোন, ওই খাটে আমি বসব না। ব্যাটা বিভূতি ঠক ওতে বসেছিল। আর—শীগগির চা নিয়ে এস।

এরা তবু চুপচাপ আছে দেখে পেতলের সাপ-ওয়ালা লাঠিটা ঠুকে বললেন—গেট আউট। এত সব দঙ্গল আছে জানলে আমি রাজুর বাড়ি কক্ষনো আসতুম না ! যত সব ভূতের উপদ্রব ! জানা নেই, শোনা নেই—ব্যাটা বিভূতিটাকে এনে ঘরে তুলেছে !

তাড়া খেয়ে ছেলেমেয়েরা বাইরে যায়। বুবন বলে—সব গোলমাল হয়ে গেল ! ভ্যাট ! কিচ্ছু ভাল লাগে না ! ওই নকুলমামাটাই ভাল ছিল। ……ওর কথায় সবাই সায় দেয়। শিকারের গল্প না বললেও রাজার গল্প—মন্দ কী !…

শেয়াল মামার কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

নতুন বাসা করা দরকার।

শেয়ালমামা তাই সেদিন চারপায়ে হাঁচোর পাঁচোর করে ঝোপের আড়ালে গর্ত খুঁড়ছিল।

সহসা তার নজরে পড়লো বোঁ-বোঁ-বোঁ শব্দ করে সেখানে উড়ছে এক ভোমরা। ঝট করে সেটাকে ধরে একটা থলের মধ্যে পুরে, সেই থলে কাঁধে ফেলে শেয়ালমামা গর্ত খোঁড়া রেখে পথ চলতে লাগল।

যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। এক সময় সামনে পড়ল একটা বাড়ি। গটগট করে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সে বাড়ির গিন্নীকে সরাসরি বললে, গিন্নীমা, আমি একটু বিদেশ যাচ্ছি। তা আপনাদের এখানে আমার এ থলেটা রেখে যেতে চাই। ফিরে এসে ফেরত নেব।

গিন্নী রাজী হয়ে বলেন, বেশ, রেখে যাও থলে।

—কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! ভুলেও কিন্তু কখনো এই থলের মুখ খুলবেন না। শেয়াল সাবধান করে দেয়।

—না না, তা কেন খুলব?

শেয়াল চলে গেল। আর অমনি গিন্নীমার ভীষণ কৌতূহল আর বাগ মানল না। কি আছে বাপু এই থলের মধ্যে দেখতে হচ্ছে তো। বারণ যখন করে গেল, নিশ্চয়ই কিছু একটা মহামূল্য বস্তু রয়েছে এর মধ্যে। প্রথমে খুলে দেখি, তারপর নয় মুখ বন্ধ করে রেখে দেব থলেটার।

এই বলে যেই না গিন্নী থলের মুখ খুলেছে অমনি ভোঁ ভোঁ করে ভেতরকার ভোমরাটা বেরিয়ে উড়ে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মুরগীটা কোঁকোর কোঁ শব্দে গপ করে সেটাকে গিলে ফেলল।

সর্বনাশ! গিন্নীর মাথায় হাত।

শেয়ালমামা যথাকালে ফিরে এল। কই, থলে কই আমার? একি, মুখ খোলা কেন? আমার ভোমরা? কোথায় আমার ভোমরা?

গিন্নীমা লজ্জিতভাবে সব খুলে বললেন।

শুনে শেয়ালমামা রেগেমেগে অগ্নিশর্মা। বললে, ঠিক আছে। তাহলে আমি মুরগীটাকেই নিয়ে যাব।

—বেশ, তাই নাও।

মুরগীটাকে থলের মধ্যে পুরে নিয়ে থলে কাঁধে ফেলে ফের গটগট করে পথ চলতে লাগল শেয়াল-মামা।

* * *

আবার পথে পড়ল একটি ছোট্ট কুটীর। সেই বাড়িতে ঢুকে থলে দেখিয়ে শেয়ালমামা গিন্নীমাকে বললে, দেখুন এ থলেটা আমার একটু রাখবেন আপনাদের বাড়িতে? আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে এটা ফেরৎ নেব।

এ-বাড়ির গিন্নীও হাসি মুখে রাজী হয়ে জানালেন, বেশ তো বাছা, রেখে যাও। কোন অসুবিধে নেই।

—তবে একটি অনুরোধ করে যাচ্ছি, ভুলেও যেন থলির মুখ খুলবেন না মা। শেয়াল বলে।

শেয়াল চলে যেতে এ-গিন্নীরও ভয়ানক কৌতূহল হল। সন্দেহ হল ঘোরতর ভাবে। মুখ খুলতে বারণ করল কেন শেয়াল! দেখি তো মুখ খুলে কি এমন রহস্যময় বস্তু রয়েছে থলের মধ্যে।

যে কথা সে কাজ। গিন্নী থলের মুখ খুলতেই মুরগীটা কোঁকোর কোঁ রবে ফুরুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে যেই না মাটিতে বসেছে সেটা, অমনি উঠোনে থাকা একটা হোঁদল কুৎকুৎ মার্কা শূয়োর মুরগীটাকে গপ করে গিলে ফেলল। কি কেলেঙ্কারী।

এক সময় শেয়াল মামা ফিরে এল। আর যেই দেখল থলের মুখ খোলা, অমনি দপ করে জ্বলে উঠে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার, আমার মুরগী কই?

এ-গিন্নীও সবিস্তারে সব কিছু খুলে বললে।

সব শুনে এবারও বেশ রেগে গেল শেয়াল-মামা—ছি ছি এত করে বলে গেলাম। বেশ, তাহলে আমি আপনাদের ঐ শূয়োরটাকেই নিয়ে যাব।

—উপায় কি, তাই নাও।

শেয়ালমামা তখন থলের মধ্যে শূয়োরটাকে পুরে কাঁধে নিয়ে আবার পথ বেয়ে চলতে লাগল।

* * *

চলতে চলতে শেয়ালমামা এক সময় গিয়ে উপস্থিত হল আরেকটি বাড়ির সামনে। যথা নিয়মে সে বাড়িতেও ঢুকে গেল শেয়াল। সেখানকার গিন্নীকে সামনে পেয়ে একই অনুরোধ করল—শুনুন। আমি বিদেশ যাচ্ছি। এই থলেটা আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। ফিরে এসে নিয়ে যাব, কেমন?

—স্বচ্ছন্দে রেখে যাও। আমার কোন আপত্তি নেই। গিন্নী সম্মতিতে মাথা নাড়ে।

—তবে একটা কথা সাবধান করে বলে যেতে চাই মা। থলের মুখ কিন্তু খুলবেন না?

শেয়াল এই বলে চলে গেল।

আর পরক্ষণেই ভীষণ কৌতূহলী হয়ে গিন্নী সেই থলের মুখটি খুলে ফেললেন। দেখতে হবে কি এমন মহামূল্য বস্তু রয়েছে এর মধ্যে যে খুলতে বারণ করে গেল। ঠিক আছে, ফের থলের মুখ বন্ধ করে রাখলেই হবে।

আর থলের মুখ খোলা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শূয়োরটা হুট করে বেরিয়ে এল বাইরে। সামনে ছিল বাড়ির পোষা বিশালকায় এক ষাঁড়, সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শূয়োরটাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে খতম করে দিল।

যথা সময়ে ফিরে এল শেয়ালমামা বিদেশ ভ্রমণান্তে।

—একি, থলের মুখ খোলা কেন? আমার শূয়োর কই?

—আর বল না বাবা দুঃখের কথা, বলে লজ্জিত গিন্নী সব ঘটনা খুলে বলল।

শেয়ালমামা যারপরনাই রেগে গিয়ে বললে—তবে আমি ষাঁড়টাকেই নিয়ে যাব।

—উপায় কি, তাই নাও বাবা।

বলতে দেরি আছে, নিতে দেরি নেই। চটপট থলের মধ্যে ষাঁড়টাকে পুরে, কাঁধে ফেলে শেয়াল-মামা গটগট করতে করতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

* * *

পথ চলতে চলতে চার নম্বর বাড়িতে এসে শেয়ালমামা সেখানে ঢুকে গিন্নীকে বললে একই কথা। সে বিদেশ যাচ্ছে। কাঁধের থলেটা সে রেখে যেতে চায় এ বাড়িতে। ফেরবার পথে নিয়ে যাবে। পারবে কি?

—নিশ্চয়ই পারব। গিন্নী বলেন—ও মা এ আর বেশী কথা কি! ঠিক আছে, রেখে যাও।

—একটা শর্ত। থলের মুখ কিন্তু খুলতে পারবেন না খবরদার।

ঘাড় নাড়েন গিন্নী। কিন্তু শেয়ালমামা চোখের আড়াল হতে না হতে আগেকার গিন্নীদের মত এ গিন্নীও—কি এমন মহামূল্য বস্তু রয়েছে থলের মধ্যে যে বারণ করছে! —বলে থলের মুখ খুলে ফেলল।

ব্যস! তৎক্ষণাৎ সা সা শিং নেড়ে বেরিয়ে এল এক বিশাল তাগড়াই ষাঁড়।

সে বাড়ির ছেলেটি লাঠি নিয়ে তাড়া করল ষাঁড়টাকে, ষাঁড়টাও লেজ তুলে চোঁ চা দৌড় দিল। ছেলেও ধেয়ে গেল পেছন পেছন। এইভাবে তাড়া খেয়ে ষাঁড় মাঠ-ঘাট বন প্রান্তর পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে পগার পার হয়ে গেল।

শেয়াল ফিরে এল ফের। —কইগো গিন্নী মা, আমার থলে ফেরৎ দিন!

শেয়ালমামা চোঁ চা দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল।
[পৃষ্ঠা ৩৩২

দেখে থলের মুখ খোলা। —এ কি! আমার ষাঁড় কোথায়?

গিন্নী খুলে বলেন বৃত্তান্ত।

শেয়ালমামার একথা শুনে রাগে সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তার মানে। ষাঁড়কে তাড়িয়েছে ছেলেটা? ঠিক হ্যায়। আমি ঐ ছেলেটাকেই নিয়ে যাব।

উপায় কি। শেয়ালমামা কালক্ষয় না করে ছেলেটাকে থলেয় পুরে, মুখ বেঁধে, কাঁধে ফেলে চলে গেল পথ ধরে।

* * *

পরের কুটিরে এসে শেয়ালের সেই একই কথা।—বিদেশ যাব মা। থলেটা রেখে যেতে চাই। ফিরে এসে নিয়ে যাব থলেটা। রাজী আছেন তো?

—রাজী আছি বৎস ! গিন্নী বলেন এ বাড়ির।

—কিন্তু কিছুতেই বাঁধা থলের মুখ খুলবেন না কথা দিন আমায়।

—কথা দিলাম। পঞ্চম বাড়ির গিন্নী অভয় দেন।

গিন্নী তখন পিঠে ভাজছিলেন বসে বসে। তার চারপাশে তার ছেলেমেয়েরা বসেছিল পিঠের লোভে।

—আমায় একটা পিঠে দাও মা।

—আমায় একটা।

—আমাকেও দাও মা। বাচ্চারা সমস্বরে চিৎকার করে বলছিল গিন্নীকে।

থলের মধ্যে বন্দী ছেলেটির নাকেও পিঠে ভাজার মিষ্টি গন্ধ গিয়েছিল। তারও খুব লোভ হল। জিভে জল এল। সবাই চাইছে, সেও ভেতর থেকে বলে ওঠে, আমায়ও একটা পিঠে দাও মা।

—আরে ! অবাক্ কাণ্ড এটি ! থলের ভেতর থেকে কে কথা কয় ?

বিস্মিত গিন্নী থলের মুখ খুলে দেয়। অমনি বেরিয়ে আসে ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে।

—ও, এই কাণ্ড ! আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা হতচ্ছাড়া শেয়ালটাকে। একথা বলে গিন্নী ছেলেটির বদলে একটা কুকুরকে থলের মধ্যে পুরে মুখ বেঁধে রাখল থলের।

যথাকালে শেয়ালমামা বিদেশ থেকে ফিরে এল। এসে দেখল থলের মুখ যেমনকে তেমনি বাঁধাই রয়েছে। খুশী হল এবার সে।

যাক বাবা, এবার আর কোন অঘটন হয়নি। ফুটফুটে ছেলেটা ভেতরেই রয়েছে।

বহুদিন ধরে হাঁটাহাঁটিতে সে ক্লান্ত শ্রান্ত। ক্ষিধেও পেয়েছে দারুণ। উঃ কি মজা ! এবার বনের ভেতর গিয়ে থলের মুখ খুলে ফুটফুটে ছেলেটাকে বের করে কচমচ করে মজাসে তাকে খাওয়া যাবে। বহুদিন বাদে বেশ সুস্বাদু একটা আহার করা হবে।

এত সব চিন্তা করতে করতে জিভে প্রচুর জল এসে গেল শেয়ালমামার। তর সইছে না আর। কালবিলম্ব না করে সে থলেটাকে কাঁধে চাপিয়ে হনহন করে পথ হাঁটতে লাগল একটা বনের উদ্দেশ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে প্রবেশ করল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। একটা নিরালা স্থান বেছে নিয়ে সে জিভের জলে ভাসতে ভাসতে থলের মুখ যেমনি খুলল অমনি যমের মত বেরিয়ে এল ভীষণদর্শন এক বিশাল কুকুর।

—অ্যাঃ। ওরে বাবা রে। বাঁচাও রে। হায় হায়রে। গেলাম রে মলাম রে শেয়ালমামার এই ধরনের চিৎকারে বন জঙ্গল সচকিত হয়ে উঠল।

কোথায় সেই রুচি নধরকান্তি ফুটফুটে ছেলেটা, যাকে সে ভেবেছিল বেশ রসিয়ে রসিয়ে সাবড়াবে, তার পরিবর্তে কিনা কোত্থেকে বেরিয়ে এল তার চিরশত্রু এই কালান্তক কুকুর !

শেয়ালমামা শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে চোঁ চোঁ দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না।

এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল কুকুরটি ধূর্ত শিয়ালটিকে শেষ করে ফেলল।

আঙুল যাদের ছয়টা

[ই. আর. জেমস্-এর "সিক্স-ফিঙ্গার্ড্-জ্যাক্স্" অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

কী কালো! কী প্রকাণ্ড!

আন্তর্নক্ষত্রচর এই পার্থিব বিমানের পেরিস্কোপ থেকে যে অগুন্তি তারা এতক্ষণ চোখে পড়ছিল, তাদের বৃহৎ একটা-অংশকে আড়াল করে দিয়ে ঐ অতিকায় বর্তুলাকার মহাব্যোমযান নেমে আসছে ঠিক একখানা আকাশজোড়া কালো মেঘের মত।

ইঞ্জিনিয়ার টার্কোর মুখ থেকে অনর্গল বেরুচ্ছে শাপমন্যি—"গোল্লায় যাক, জাহান্নমে যাক ওরা, যেখান থেকেই এসে থাকুক, যে-জাতেরই যা হোক, নিপাত যাক দুশমনেরা! দেখে ফেলেছে নিয্যস্! দেখে ফেলেছে আমাদের!"

ইঞ্জিন-ঘরে পর্দা খাটানো আছে। তাতে সব-কিছুর ছবি ফুটছে। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে যেদিক থেকেই যা আসুক, তার চেহারা ধরা পড়বেই এটির উপরে। সেই পর্দার পানেই ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে টার্কো। ধনুকের মত বাঁকা পা-দুখানা ক্রমশঃ ফাঁক হচ্ছে ধাতু দিয়ে গড়া অনাকৃতা ডেক-এর উপরে। হাতের দুটো প্রকাণ্ড মুঠি, বুঝি তার অজান্তেই একবার খুলে যাচ্ছে, একবার বন্ধ হচ্ছে। বন্ধ হওয়ার ধরনটাই এইরকম, যেন কিলিয়েই টার্কো ঐ ব্যোমচর দানবকে তাড়িয়ে ছাড়বে এ আকাশ থেকে। কদমছাঁট মাথাটা কুঁজিয়ে আসা কাঁধের উপর যত নেমে আসছে, গলাটা তত মুটিয়ে উঠছে ষাঁড়ের গলার মত।

বাঁয়ে চোখ ফেরাল টার্কো। থরে থরে সাজানো যন্ত্রপাতি, তার মধ্যে ডায়ালে ডায়ালে পরিমাপক সংখ্যা আঁকা রয়েছে। দূরত্বের পরিমাণটা একবার দেখে নিল শুধু। ঐ ধাবমান দানবের থেকেই নয় কেবল, পায়ের দিকের ঐ অজানা অচেনা চাঁদটার থেকেও। কোন রকমে ঐ চাঁদে নেমে যদি চুপিসাড়ে গা ঢাকা দিতে পারা যেত!

যেত নিশ্চয়ই, একটু আগে টের পেলে! ঐ হানাদারের আচমকা আবির্ভাব। এত আচমকা সে এত কাছে এসে পড়ল কেমন করে? সতর্কতার অভাব ছিল এ-তরফেই, টার্কো তা মুক্তকণ্ঠেই বলতে রাজী আছে। রেখে-ঢেকে কথা সে কাউকে বলে না। ঝাল ঝাড়ল রেডিও-ঘরের দিকে তাকিয়ে—"চোখ বুজে ছিলে নাকি?"

রেডিওর অ্যাবে খেঁকিয়ে উঠল। তার ঘরেও অজস্র ডায়াল। তাদেরই ভিতরে আঙুল চালাচ্ছিল এতক্ষণ। চালিয়েই যাচ্ছে এখনো। তারই মধ্যে দাঁত বার করল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত—"নীচের ঐ চাঁদটার বর্ণালি বিশ্লেষণ নিয়ে আমি ব্যস্ত আছি, সেটা জানো না, বলতে চাও? চোখ মেলে রাখা, তা তুমিই বা রাখ নি কেন? যতই কানা হও, হানাদারটা ত গতরে রীতিমত পুরুষ্টু! চোখে না-পড়ার মত নয়।"

"আমারও ত তুমিই হাত-পা বেঁধে রেখেছিলে! বিমান একটুও যেন না নড়ে, কড়া হুকুম দিয়ে রাখনি? নড়লে বিশ্লেষণ ঠিক হবে না, বলনি? তোমার কাজে এতটুকু অসুবিধে ঘটলে তুমি কীরকম চেল্লাচিল্লি কর, তা জানি না নাকি?"

ঝাঁঝালো গলায় কৈফিয়ত কেটে টার্কো প্রশ্ন

ঝুঁকে পড়ে নিজের যন্ত্রপাতি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল অ্যাবে।

করল—"দুটো কাজ কেউ একসঙ্গে করতে পারে নাকি? বিশেষ করে আন্তর্নক্ষত্রে বিমান চালাবার সময়?"

অ্যাবে মোটে কানই দেয়নি টার্কোর কথায় শেষ দিকটায়। "চেল্লাচিল্লি" শব্দটাই তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে একদম—"ঐ উপগ্রহটার ভিতরে কী আছে, আর কী নেই, তা এতদূর থেকে সঠিক বলে দেওয়া খুবই সহজ কাজ বোধ হয় তোমার বিবেচনায়?"

ঝুঁকে পড়ে নিজের যন্ত্রপাতিই মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল অ্যাবে, আর টার্কোর দিকে ছুঁড়ে মারল একটা তিক্ত রসিকতা—"বুট-পরা পা একখানা যখন নেমে আসছে পিঠের উপরে, জানতে পারলে পিঁপড়ের মনের অবস্থাটা কীরকম হয়? আগে জানতে না বোধ হয়? এইবার জানবে, ঐ দৈত্যাকার হানাদার পিঠে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে—"

তেতো ধোঁয়া আসছে একটা সরু নলের মুখ থেকে। রেডিও-ঘরেও বটে, ইঞ্জিন-ঘরেও বটে। অ্যাবে আর টার্কো ঝটিতি মুখ ফেরাল কাপ্তেনের টেলিভিশন পর্দার দিকে। ওটা সব সময়ই সংরক্ষিত থাকে, কাপ্তেনের আদেশ নির্দেশ জানাবার জন্য। দুইজনেই দেখতে পেল, পর্দায় কাপ্তেনের ছবি। নিজের ঘরে বসে তিনি এক গাদা কাগজ পোড়াচ্ছেন সযত্নে। তার ভিতরে এমন এমন ম্যাপ রয়েছে কিছু, টার্কোরা জানে, তা একবার নষ্ট হলে নতুন করে আর তৈরি করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ কাপ্তেন দস্তুরমত মরিয়া। এদিক থেকে যে ওরা যার যার ঘরের পর্দায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, এটা নিজের কেবিনে বসেই জানতে পেরেছেন কাপ্তেন জানুয়ার। তিনিও তাকিয়েছেন তাঁর পর্দার দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেল এদিকে কাপ্তেন আর এদিকে ইঞ্জিনিয়ার-রেডিওম্যানের মধ্যে। যদিও পাশাপাশি ঘর নয়, এবং ব্যাবধানটার ভিতরে ধাতু দিয়ে গড়া দেয়াল আছে অন্ততঃ আধ ডজন।

কাপ্তেন জানুয়ারের চড়িয়ে-ভাঙ্গা গাল দুটো আজ যেন আরও বেশী চুপসে গিয়েছে, মুখের হাঁ একদম বুজিয়ে দিয়ে তারা যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাওয়ার চেষ্টা করছে পাল্লা দিয়ে। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে থেকে কালো চোখ একবার তাকাচ্ছে অ্যাবের দিকে, আর একবার টার্কোর দিকে—

"মনে কর ঐ হানাদারটা অন্য কোন ছায়াপথের বাসিন্দা। কী মনে করে ও আমাদের দেশে এল, তা জানি না যখন, নিজেদের দিক থেকে সাবধান থাকা ভাল। পার্থিব সাম্রাজ্যের ভিতর যত যত গ্রহে উপনিবেশ আছে আমাদের, তার একটা ফিরিস্তি, কোন্ কক্ষপথে কত দিন উড়লে কোথায় যাওয়া যায়, সেখানে জল হাওয়া উত্তাপ আর জীবজগৎ উদ্ভিদজগতের অবস্থা কী, তার সব কিছু বিবরণ কেন আর ওদের হাত তুলে দিই ?"

একটুখানি বিরস হাসি হাসলেন কাপ্তেন—"অবশ্য যা সব পোড়াচ্ছি, তা অকেজো। কোথায় কোথায় গিয়ে লাভ নেই, তারই দীর্ঘ তালিকা। আমাদের ছায়াপথে এ-যাবৎ এমন একটা গ্রহ চোখে পড়ল না, যার খনি থেকে কাজে লাগার মত কোন ধাতু তুলে নিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো যায়। যেমন ধর ইউরেনিয়াম পেলাম কোথাও ? অথচ ধরতে গেলে পৃথিবীর ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ার আজ শূন্য। আকাশে আকাশে এই ঘোরাফেরায় লাভ কিছু নেই।"

অ্যাবে অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করছে—"এ কথা ত আগে বলেন নি! তা যদি বলতেন, তা হলে এত ঝক্কি ঝামেলা মাথায় নিয়ে আমরা কি আসি আপনার লোকসানি কারবারের শরিক হতে ?"

একটু থেমে সে সংযত করে নিল নিজেকে, কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল—"মাথার উপরে ঐ যে ওঁরা রয়েছেন, ওঁদের দানবাকার বিমান থেকে রশ্মি বিকিরণ করছেন কমসে-কম ষাট রকম এ-যাবৎ। এক রকমেরও মানে বুঝতে পারিনি।

কাপ্তেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—"বুঝতে পারা যাবে, এমন আশা করি কেমন করে ? গ্রহান্তরের কথা নয়, অন্য সৌরমণ্ডলের ব্যাপার নয়, একেবারে আলাদা এক ছায়াপথের বাসিন্দা ওরা। কেমন হবে জীবগুলো, আন্দাজ করতে যাওয়াই দুঃসাহসের কাজ। তবে একটা দিকে অন্ততঃ অভিযোগ করার কিছু নেই। ওরা এখনো পর্যন্ত ক্ষতির চেষ্টা করেনি আমাদের—"

"এখনো পর্যন্ত করেনি, তা ঠিক"—তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল টার্কো—"হয়ত কারণ আছে তা না করার। কিন্তু দুই-পাঁচ মিনিট বাদেই যে করবে না, তার নিশ্চয়তা কিছু আছে ? ধরে নিচ্ছি ওরা দিগ্বিজয়ে বেরোয়নি, বেরিয়েছে অহিংস গবেষণায়। কিন্তু অভিযানের মুখে অন্য সভ্যতার প্রতিনিধি কাউকে—যেমন ধরুন আমাদের এই দলটাকেই হঠাৎ দেখতে পেলে অহিংস সৌজন্যেই তাদের পথ থেকে সরে যাবে, এমনটা আশা করার কোন ভিত্তি আছে কি ?"

জানুয়ার হঠাৎ কোন জবাব দিচ্ছেন না দেখে, সে সাহস পেয়ে দাবি জানাল—"আপনি যদি বলেন, আমাদের এই মোচার খোলার মত বিমানটারই চারদিকে বিদ্যুতের বেষ্টনি ছুঁড়ে দিই এক্ষুণি। ওরা যে আমাদের সাবড়ে দেবার মতলবেই নেমে আসছে, তাতে সন্দেহ না রেখে, যথাশক্তি ওদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হওয়াই দরকার আমাদের"—

"দরকার নিশ্চয়ই।"—চিন্তিতভাবেই জবাব দিলেন জানুয়ার—"কিন্তু বেষ্টনী-ফেষ্টনী দিয়ে কতদূর কী কাজ হবে, ভাবছি তাই।"

"হয়ত কিছুই হবে না"—বলল টার্কো—"তবু বাছাধনদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, ক্ষুদে হলেও হুল ফোটাতে জানি আমরা"—

"বেশ, তাই ফোটাও তাহলে"—বললেন কাপ্তেন।

তাঁর কথার সুর শুনে অঙ্গ জ্বলে গেল টার্কোর। কাপ্তেন যেন ধরেই নিয়েছেন যে এ-পক্ষের করবার

কিছুই নেই। ঐ পঞ্চাশ মাইল চওড়া দৈত্য-বিমান আসবে, আর গিলে ফেলবে পৃথিবীর এই সর্বত্রগামী মহাব্যোমযানকে, যাকে নাকি ত্রিংশ শতাব্দীর বিমান-বিজ্ঞানীরা সাজিয়ে দিয়েছেন সবরকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে। টার্কো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—আসুক ঐ দৈত্য, এক হাত শিক্ষা ওকে না দিয়ে ছাড়বে না সে।

জানুয়ার লক্ষ্য করলেন, তাঁর সম্মতি আদায় করেই টার্কো টেলিভিশন সংযোগ কেটে দিল, তাঁর ধরাছোঁয়ার আড়ালে যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ বিদ্যুৎবেষ্টনীর নাম করে অন্য কিছু একটা সে প্রতিরোধ খাড়া করতে চাইছে, যার কথা আগে থাকতে সে জানাবে না কাপ্তেনকে। এটা ত অন্যায়! এরকম স্বাধীনতা ত কাউকে দেওয়া যায় না!

কাপ্তেন অ্যাবের দিকে তাকালেন। সে চিন্তিত, বিবর্ণ। বোঝাই যাচ্ছে, টার্কোর ভাবভঙ্গী তারও ভাল লাগেনি। কাপ্তেন তাকে বললেন—"দেখা যাক, ও কী করে। আগে থাকতে ঘাঁটাব না, কাজের উপরে থাকলে টার্কোর মেজাজ থাকে ভাল। আমি তোমার ঘরেই আসছি।" রেডিও-ঘরের টি. ভি. সংযোগও কেটে গেল এর পরে।

রেডিও-ঘরটাকে অ্যাবে করে রেখেছে যেন গুদামখানা। মাঝারি আকারের ঘরখানা মালপত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বোঝাই। সবই যে নিত্য-প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, তা কিন্তু একেবারেই নয়। মেজেতে গাদা করা রয়েছে, ঐ যে হাজারো রকমের বড়-ছোট টুকিটাকি জিনিস, ও সবই অ্যাবের নিজস্ব। সারা জীবনে তার সঞ্চয় বলতে ঐগুলিই। যখনই যেখানে পুরানো, ভাঙ্গা যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ পেয়েছে, কিনে নিয়েছে এই আশায় যে, একদিন হয়ত তা কাজে লাগবে তার।

কাজ? হ্যাঁ, একটা উঁচুদরের কাজ যে একদিন করে তুলবে অ্যাবে, এ স্বপ্ন সে প্রথম যৌবন থেকেই দেখে আসছে। একটা নব আবিষ্কার, যার সাহায্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম কোণের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। রেডিওর গতি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, টেলিভিশনেরও না। এ-যাবৎ পৃথিবীর মানুষ ব্যোমযাত্রায় দশ-বিশ আলোকবর্ষের চেয়ে বেশী দূরত্বে পৌঁছোতেই সক্ষম হয়নি। পৌঁছে থাকলেও গিয়েছে আর চলে এসেছে, সেখানে খবরাখবর দেওয়া নেওয়ার মত ঘাঁটি গড়ে রেখে আসতে পারেনি। কী করে পারবে? বিজ্ঞান এমন কোন সূত্রের সন্ধান দিতে পারেনি এখনো, যার সাহায্যে দৃষ্টি বা শ্রুতিকে অসীমে পরিব্যাপ্ত করা যেতে পারে।

অ্যাবে স্বপ্ন দেখে—সে কাজ সেই হাঁসিল করবে একদিন।

মেজেতে ছড়ানো ঐ সব গাদা গাদা যন্ত্রপাতির টুকরো—ওরা সেই মহান আবিষ্কারেরই সম্ভাব্য উপকরণ। ওদের উপরে দরদের অন্ত নেই অ্যাবের। এ বিমানে যখন সে চাকরি নেয়, পহেলা-নম্বর শর্তই তাই ছিল যে ব্যক্তিগত একটা ল্যাবরেটরি সঙ্গেই যাবে তার। জানুয়ার আপত্তি করার কোন কারণ দেখতে পাননি, কিন্তু ল্যাবরেটরির স্বরূপ যখন তাঁর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল, তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হল না আর। কোন্ অভিধানেই যে ল্যাবরেটরি শব্দের অর্থ লিখেছে বাতিল লোহালক্কড় বলে, তা তার জানা ছিল না।

আজ অ্যাবে হতাশ নয়নে তাকিয়ে আছে ঐ লোহার গাদার দিকে। হয়নি এখনও সে-পদ্ধতির আবিষ্কার, যার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম ছায়া-পথের বাসিন্দাদের সঙ্গেও ভাবের আদানপ্রদান সম্ভব হওয়ার কথা। আবিষ্কার হয়নি, কিন্তু সুদূরতম সে-ছায়াপথের বাসিন্দারা ঐ যে আগু-

বাড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে অ্যাবেরই দোর-গোড়ায়। ঐ যে তাদের পঞ্চাশ মাইল চওড়া বিমান। এখন কীভাবে কথা কওয়া যায় ওদের সঙ্গে?

কী জাতীয় জীব আছে ওর ভিতরে, জানা যাচ্ছে না এখনও। জানা এক সময়ে যাবেই। কিন্তু হয়ত এমন সময়ে যাবে যে, জানার দরুন লাভবান হওয়ার অবকাশ আর পাবে না অ্যাবেরা। আত্মপ্রকাশ ওরা করবেই, কিন্তু সম্ভবতঃ তা করবে, এই মশার মত ক্ষুদে বিমানখানাকে নস্যির মত নাসারন্ধ্রে আকর্ষণ করে নেবার মুহূর্তেই।

অথচ অ্যাবের আবিষ্কারের স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থেকে না যেত এখনও, তাহলে আলাপে পরিচয়ে ওদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন সম্ভব হত হয়ত, হঠাৎ একটা অসম কলহে লিপ্ত হতে হত না। হয় নি তা, হয় নি।

কিন্তু, যত নৈরাশ্যই থাকুক মনে, হাত কিন্তু ক্রমাগতই চলছে ওর। নানা কৌশল, হরেক-রকম কায়দা সে করে যাচ্ছে রেডিওর উৎক্ষেপণে। দেখতে চায়, কোনটাতেই সাড়া দেয় কিনা ঐ রাক্ষুসে আগন্তুক।

কাপ্তেন জানুয়ার এসে ঢুকলেন নিঃশব্দে, অ্যাবে টেরও পেল না। কাপ্তেন একবার তাকিয়ে দেখলেন শুধু। দেখলেন যে, অ্যাবের কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠেছে গভীর উত্তেজনায়। ওকে বিরক্ত না করে তিনি একটা লোহার গাদার উপরে খাঁটি হয়ে বসলেন, অনির্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে। অনির্দিষ্ট কাল! অর্থাৎ যতক্ষণ-না হানাদারেরা একটা কিছু করে। ওদের চাল না দেখে এরা ত ব'ড়েটাও টিপতে পারে না! ওরা যখন প্রবল। কত গুণ প্রবল? এক শো মিটারের যত গুণ বড় পঞ্চাশ মাইল।

অবশ্য আয়তনই বলের পরিচায়ক নয়, তা জানুয়ার বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু কথা ত তা নয়!

টেলিভিশন-পর্দায় দেখা গেল টার্কোর হাস্যবিকশিত মুখ। [পৃষ্ঠা ৩

অত বড় বিমান যারা গড়েছে, অত বড় বিমান যারা অন্য ছায়াপথ থেকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এই সুদূর সৌরমণ্ডলে, তারা বিজ্ঞানী হিসাবেও যে মহাশক্তি-ধর, তা স্বীকার না করবে কে? পৃথিবীর লোক ত এখনো অন্য ছায়াপথে গবেষণা চালাতে পারে নি বিমান পাঠিয়ে।

কাপ্তেন চুপ করে বসে' আছেন, কারণ কথা কইলেই যে সহকর্মীদের কাজের ক্ষতি হবে, তা তিনি জানেন। বসে আছেন নিঃশব্দে। হঠাৎ বিমানখানা কেঁপে উঠল আপাদমস্তক থরথর করে। কী হল? কী হল? শত্রুর বিমান বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আঘাত হেনেছে নাকি?

প্রশ্নটা গলা ছেড়েই করতে হল কাপ্তেনকে। অ্যাবে জবাব দিতে পারল না চট্ করে, কিন্তু ইঞ্জিন-ঘরের টেলিভিশন-পর্দা হঠাৎ ফুটে উঠল চোখের সামনে, আর তাতে দেখা গেল টার্কোর হাস্যবিকশিত মুখ—"বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ওদের দিক থেকে কী করে আসবে? আমাদের বিদ্যুৎ বেষ্টনীই ছড়িয়ে আছে দিগ্‌দিগন্তে। আমি দিয়েছি ছড়িয়ে। রীতিমত লড়াই না করে ওরা পার হতে পারছে না সেটা। কাঁপুনিটা বৈদ্যুতিক আঘাতের দরুন নয়। আমরা চাঁদে নেমেছি সেই ধাক্কার দরুনই বিমান কাঁপল।"

"চাঁদে নেমেছি!" মস্ত একটা আশ্বাস। এখন লড়াই হলেও খানিকটা সুবিধা এ-পক্ষের। এদের পায়ের নীচে শক্ত মাটি, ওদের ফাঁকা শূন্য। হঠাৎ মায়া না-পড়তেও হতে পারে।

"এখন তাহলে কতকটা নিরাপদ আমরা—" বললেন কাপ্তেন।

টার্কো জবাব দিল—"এবারে আপদের পালা ওদের কাপ্তেন। এই বোমাটা যতক্ষণ গড়ে তুলতে না পারছি, ততক্ষণই জারিজুরি ওদের, তারপর দেখে নেব।"

"বোমা? কী বোমা?"—আঁৎকেই উঠলেন কাপ্তেন।

"অ্যাটম!" হাঁকল টার্কো ওধার থেকে—"দরকার হলে হাইড্রোজেন বোমাও গড়তে পারি এইখানে বসে। তবে তা করতে হলে আমায় ইঞ্জিনখানাই ভেঙ্গেচুরে ফেলতে হয় উপকরণের জন্য। দরকার নেই, অ্যাটম বোমার ধাক্কাই আগে সামলাক ত!"

কাপ্তেন রেগে কাঁই—"খবর্দার টার্কো। আমার হুকুম না নিয়ে তুমি বোমা ছুঁড়বে না ওদের উপরে। তা সে অ্যাটম বোমাই হোক, আর ধানীপটকাই হোক। ওরা এখন পর্যন্ত এমন কোন ভঙ্গি দেখায়নি, যাকে শত্রুতাব্যঞ্জক মনে করা যেতে পারে।"

"আমাদের ছায়াপথের এলেকায় অনধিকার প্রবেশটাই এক নম্বর শত্রুতা নয় কি?"—টার্কোর গলায় বিদ্রোহের সুর।

সে-সুরে কাপ্তেনের আরও রেগে যাওয়ার অধিকার ছিল। তাই যেতেনও হয়ত তিনি, কিন্তু হঠাৎ তাঁদের সবাইকে চকিত হতবাক্ করে দিয়ে একটা ঘটনা ঘটল মাথার উপরকার রাক্ষুসে বিমানে। মিশকালো দেয়ালটা যেন ফাঁক হয়ে গেল তার, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিগোচর হল প্রকাণ্ড একটা কক্ষ, আলোয় আলোয় সমুজ্জ্বল। সেই ঘরে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে অগুন্তি জীব। মানুষেরই মত।

মানুষ? আছে বই কি! মানুষের চেহারার আদল অনেকখানিই আছে তাদের মধ্যে। কেবল ঐ চোখ! গোল-গোল ভাঁটার মত, সাদার ভিতর নীল, নীলের ভিতর মণিটা আবার ঘোর কালো! মুখের হাঁ ঠিকই আছে, নেই তার উপরে নীচে ঠোঁট। মাথায় চুল নেই, চকচকে-সাদা কী যেন একটা আবরণে তা ঢাকা। খানিক ঠাহর করে দেখবার পরে অ্যাবে বলে উঠল—"শুধু মাথা নয়, সারা গায়েই সাদা লোম ওদের।"

লম্বা? না, মানুষের মত অত লম্বা নয়, শরীরও পাতলা।

সব দিক বিচার করে "অপমানুষ" আখ্যা এদের অনায়াসেই দেওয়া যায়।

একটি বিশেষ অপমানুষ দল ছেড়ে এগিয়ে এল এই বার, আর ঠিক যেন এদেরই দেখাবার জন্য দু'খানা হাত উঁচু করে ধরল। লম্বা, সরু দু'খানা হাত, গোটা দেহটার সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছে গড়নের দিক দিয়ে। আর সেই হাতে বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস, আঙুল প্রতি হাতেই ছয়টা করে। তিনটে আঙুল বেঁটে, মানুষের বুড়ো আঙুলের মত। বাকী তিনটে লম্বা, মানুষের হাতের মধ্যমা তর্জনী অনামিকার মত। সাজানোরই বা কী

কায়দা আঙুলগুলোতে। একটা লম্বা, একটা বেঁটে। আবার একটা লম্বা, একটা বেঁটে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় এরা পেল, অপমানুষটির হাত পর্যবেক্ষণের জন্য। তারপর সে পিছিয়ে গেল ঘরের ও-পাশে। সেখানে দেয়ালের গায়ে কালো বোর্ড রয়েছে একখানা। খড়িমাটি নিয়ে অপমানুষটা কী যেন লিখতে যাচ্ছে বোর্ডে। তার সহযোগীরা ডাইনে-বাঁয়ে সরে গিয়েছে, প্রতিপক্ষ যাতে বোর্ডের লিখন অবাধে পড়তে পারে, তারই সুযোগ দেওয়ার জন্য বোধ হয়।

অপমানুষটি এইবার দুই হাত উঁচু করে ধরল বারোটা আঙুল মেলে। তার পরে হাত গুটিয়ে নিয়ে বোর্ডে খাড়া দাগ দিল একটা। মানে কী এর?

সে আবার ফিরল এদের দিকে। আবার দুই হাত উঁচু করে বারো আঙুল দেখাল, তারপর বোর্ডের খাড়া দাগের পাশে লম্বা করে টানল আর একটা দাগ।

দু'টো দাগ। প্রতিবারে বারো আঙুল দেখিয়েছে। ও কি চব্বিশ-সংখ্যার কোন একটা জিনিস বোঝাতে চাইছে?

কিন্তু না, ও ত থেমে যায়নি। আবার হাত দেখাচ্ছে, আবার দাগ কাটছে। বার বার সাত-বার। সাত-বারং চুরাশী? কী চুরাশী?

না, চুরাশীও নয়। আবার হাত তুলেছে ও। তবে এবারে এক হাতের ছয়টা আঙুল দেখাচ্ছে অন্য হাতের মোটে দু'টো, বাকী চার আঙুল মুড়ে রেখেছে।

ছয়ে আর দুইয়ে আট হল। আর আছে আগের চুরাশী।

একুনে বিয়ানব্বুই।

বি-য়া-নব্বুই? বলছে-বিয়ানব্বুই? যার মানে হল ইউরেনিয়াম? পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামকে এযুগে ডাকেন বিয়ানব্বুই বলে। বিয়ানব্বুই-সংখ্যক ধাতব পদার্থ। কিন্তু অন্য ছায়াপথের বাসিন্দা এরা, সে নামকরণের খবর পেল কোথা থেকে?

তবে কি পৃথিবীর মানুষের অজান্তে পৃথিবীর নাড়ির খবর এই অন্য ছায়াপথবাসীরা নখদর্পণে দেখতে পায়?

অসম্ভব কী? যারা পঞ্চাশ মাইল চওড়া বিমান গড়ে, তাদের জ্ঞানের পরিমাপ করা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে কেমন করে?

কিন্তু অপমানুষটি চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। বোর্ডের উপরে গাদা গাদা ধাতুপিণ্ড এঁকে যাচ্ছে। বিরাট স্তূপ এঁকে ফেলল একটা।

ইউরেনিয়ামের গাদা?

অপমানুষটি সেই গাদার মাঝখান দিয়ে লম্বা দাগ টেনে দিল এইবার। দাগের দুইদিকে দু'টো গাদা এইবার, দু'টোই সমান।

অর্থাৎ?

কাপ্তেন বললেন—"ওদের প্রস্তাব হল এই যে, এই চাঁদের মাটিতে যে ইউরেনিয়াম আছে, তা আধা-আধি বখরা হোক দুই দলের মধ্যে। আমি এতে আপত্তির কিছু দেখি না। কারণ এলাকাটা যদিও আমাদের, আগে আমরা এটা দখল করিনি। ওরা অনধিকারী হলেও আগে এসেছে এবং আবিষ্কার করেছে জিনিসটা।"

এর পরে কাপ্তেন জানুয়ার দেখা দিলেন নিজের টেলিভিশনে। দুই হাত বাড়িয়ে তিনি যেন আলিঙ্গন করতে চাইছেন ওদের। ওদিক থেকে ভেসে এল একটা আনন্দ-কলরব। অ্যাবে এদিকে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। সে যা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পারেনি, মামুলী আঁকজোক কেটেই তা হাঁসিল করেছে এই অপমানুষেরা। অন্য ছায়াপথ-বাসীদের সাথেও ভাবের আদানপ্রদানে সক্ষম হয়েছে অত্যন্ত আদিম উপায়ে।

ভুলুয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

মগের মুল্লুক? হাঁ, তাইত দাঁড়াল দিনের দিন। সোনার বাংলা ত মগের মুল্লুকেই পরিণত হয়ে গেল হাম্বির নস্করের চোখের সামনেই।

মগ! মগ! মগ! পোর্তুগীজ হার্মাদের মত অত নৃশংস অবশ্য এরা নয়। গ্রামকে গ্রাম নারী পুরুষ সবাইকে বেঁধে জাহাজের খোলে পুরে নিয়ে যায় না বিদেশের বাজারে বিক্রি করে দেবার জন্য, কিন্তু লুটপাটের কথা যদি ধর সেদিক দিয়ে ওরা এক তিল রেয়াদ করে না কাউকে। আসবে ঠিক তখনই, ফসলটি যেই গোলায় উঠেছে চাষীর। এই পৌষের গোড়ায় কি মাঝামাঝি। গ্রামে চলেছে ঘরে-ঘরে নবান্নের ধুম। ওরা এসে থুতনির নীচে তিন গাছা লালচে দাড়ি নাচিয়ে আবদার ধরবে—"পায়েসের বখরা আমাদের দিবি না গেরস্ত?"

বখরা? কড়াসুদ্ধ উবুড় করে দাও ওদের হাঁয়ের ভিতর, তৃপ্তি নেই ওদের। গেরস্তর গোলা কেটে ধান বার করে নেবে, সিন্দুক ভেঙ্গে বার করে নেবে টংকা, বৌ-ঝিদের গা থেকে কেড়ে নেবে বাউটি, বাজু, কণ্ঠহার, চন্দ্রহার। আগে ভাগে সরিয়ে ফেলা? তাহলে কি নিস্তার আছে নাকি? গাঁয়ে গাঁয়ে খোঁজারু আছে ওদের। চর! গোয়েন্দা! গাঁয়ের ঘাটে নামবার আগেই জাহাজে বা ছিপে বসেই মগেরা খবর পেয়ে যায়—কোন্ গেরস্ত কত ধান তুলেছিল এবার। তার মধ্যে কোন্ ব্যাপারীর কাছে বেচে দিয়েছে ইতিমধ্যে কত মন, দাম পেয়েছে কত তার দরুন। সেই হিসাব ট্যাঁকে নিয়েই মগেরা হানা দেবে ঘরে ঘরে। বেচে দিয়েছিস? দামের শতকরা দশ টাকা রেখে দিতে পারিস তোর মেহনতি আর দালালি বাবদ।

বাকী নব্বুই টাকার হকদার তোরা ব্যাটারা মোস কেউ, আগে মগরাজা থেনসুংবংকার সেলামি দে, খাজনা মিটিয়ে দে, তারপর অন্য কথা ক'।

সেলামি ? খাজনা ? শব্দগুলো বোড়া সাপের মত নম্র, মাথা নীচু করে চলে, কিন্তু কামড় মেরে বিষ যা ঢালে, তা একেবারে চূড়ান্ত, ধন্বন্তরির ত অসাধ্য তা। সেলামি বলতে টান দেবে দু'চক্ষে যা পড়বে; তার সব কিছুই। আর খাজনা বলতে ওরা ইশারা করবে দু'চক্ষে যা পড়ছে না, তাই। অর্থাৎ মাটির নীচে পোঁতা আছে যা কিছু।

আজ নিয়ে এই সাত বচ্ছর হল পরপর। হাম্বির নস্করই বল, আর সোঁদলা গাঁয়ের অন্য যে কোন গেরস্তই বল, আজ সাত বচ্ছর সবাই উপোসী। উপোস কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে হবে অবশ্য। সত্যি সত্যি সাত বচ্ছর কেউ উপোস দিতে পারে না। সাত দিনেই টেঁসে যাবে, যত বড় তাগড়া যোয়ানই হোক না কেন। তা নয়, নিরম্বু উপবাস যাকে বলে, তা নয় অবশ্য। হয় কী, জান ?

সব চেঁচে পুঁছে তুলে নিয়ে মগেরা ত তরতরিয়ে দরিয়া পানে নেমে গেল মেঘনা বেয়ে। সব গাঁয়ের লোক তখন করল কি, তাই শোন। গাঁয়ের খোঁজারু যে আছে, নাম তার হরু গোঁসাই হোক আর নিয়ামৎ মোল্লাই হোক, তার কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ল। বাঁচাও মোল্লা, বাঁচাও গোঁসাই, দোহাই আল্লার, দোহাই তোমার বাঁকা কেষ্টর! তোমার মগ সুমুন্দিরা ত লইয়া গেল সগ্‌গোল কিছু ঝাইর‍্যা ঝুইর‍্যা, এ্যাহন আমাগো জানডা বাচাওনের কী করবা, হেইডা কয় দিহিন!

জান এদের বাঁচাতেই হবে, তাতে সন্দেহ নেই। গাঁয়ের সব লোক যদি মরেই যায়, জমিতে লাঙ্গল নামাবে কে ? চাষবাস যাতে চালু থাকে, সেদিকে দৃষ্টি আছে মগেদের। সোনার ডিম যে-হাঁস দেবে, তার পেট চিরে মেরে ফেলার মত মূর্খ ওরা নয়।

খোঁজারু নাক মলে, কান মলে। পীর পয়গম্বরের কসম নেয় মুসলমান হলে, তেত্রিশ কোটি দেবতার দোহাই পাড়ে হিন্দু হলে—আমি কি তোমাগো ছাড়া অইন্য কেউ ? মগেরা তোমাগরও যেমুন সগগোল লুইট্যা লইছে, আমারও লইছে তেমুন কইর‍্যাই। চাইয়া দ্যাহ, গোলা ফাঁক।

গোলা সত্যিই ফাঁক, চর্মচক্ষেই তা দেখা যায়। কিন্তু তবু কিছু কিঞ্চিৎ ধান আছে। কোথায় আছে, খোঁজারু ছাড়া কাক-পক্ষীতে জানে না। লোকে আঁচ করে কোন গঞ্জে বা বন্দরে কোন আড়তদারের হেফাজতে থাকা সম্ভব। যে আড়তদার মগেদের আশ্রিত, দলভুক্ত, সারা দেশটাই ত ওদের চর আর হুকুমবরদারে ছেয়ে আছে কিনা!

খোঁজারুর সঙ্গে যা হোক কিছু বন্দোবস্ত এবার হয় চাষীদের। আগামী বারের ফসল উঠবে যখন, খোঁজারুকে তা থেকে দাদনের চতুর্গুণ ধরে দিতে হবে আগেভাগে। এটা মগেরা জানতে পারবে না। কারণ জানাবার মালিক ত খোঁজারুই। সে যা গোপন রাখতে চাইবে, তার আর ভিন্‌দেশী হানাদার সন্ধান পাবে কেমন করে ?

গ্রামবাসীরা যৎকিঞ্চিৎ ধান পেল এক এক বেলা এক এক মুঠি অন্ন পেটে দেবার জন্য। ধান বিক্রির টাকা দশ ভাগের এক ভাগ খয়রাত করে গিয়েছে মগেরা, তাই দিয়ে চাষের খরচ চালিয়ে নাও, তাই দিয়ে কড়ে-ওড়া ঘরের চালে খড় চড়াও, তাই দিয়ে বাপের ছেরাদ্দ কর, ছেলেমেয়েরও বিয়ে দাও! বাদ থাকবে না কিছুই। মগের মুল্লুকে এইভাবেই জন্ম কাটায় অভাগা বাঙ্গালী।

"আমি কী জানি ? আমি কী জানি ?"—কহছে হরু গোঁসাই। "খোদার মালিক, আমি

জানি না কিছু"—কাৎরাতে থাকে নিয়ামত মোল্লা।

কী ব্যাপার ?

রাজার পাইক এসেছে সোঁদলা গ্রামে। স্বর্ণধূল নাম ছিল সেই সত্যযুগে। তখন এখানকার ধূলোতে সোনার রেণু মেশানো থাকত। কিংবা হয়ত এখানকার ধূলো থেকে ফসল ফলত এত পর্যাপ্ত যে সোনাদানার শখ মেটানো কোন গেরস্ত বৌয়ের পক্ষেই কঠিন হত না। যাই হোক, স্বর্ণধূল হয়ে দাঁড়িয়েছে সোঁদলা যুগধর্মে, আর সেই সোঁদলায় মগের প্রতিনিধি হিসেবে জোর ব্যবসা চালাচ্ছে এ-পাড়ায় হরু গোঁসাই, আর ও-পাড়ায় নিয়ামত মোল্লা।

রাজার পাইক, কিন্তু কী আশ্চর্য, মেজাজ তার ত গরম নয় মোটেই! তুচ্ছ একটা তালুকদারের পাইকের বিক্রমে যেদেশে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেদেশে খোদ রাজারই পাইক হয়ে এ লোকটার মুখে রা নেই। কারও সঙ্গে কথা যদি কইতে হল, সমবয়সী হলে সম্বোধন করবে দাদা, বয়স্ক লোক হলে নির্ঘাৎ ডেকে বসবে খুড়োমশাই বলে। এ নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। যদিও হরু গোঁসাই এক কথায় এর অভিভক্তির সব রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে! "খুঁটোর জোরে ম্যাড়া কোঁদে, জানিস না রে? তা ওর যে খুটো, মানে খোদ যে রাজা, তারই দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে আরাকানী থেমসুবং। পাইক ত নিজের মনিবের মুরোদ জানেই, লাফঝাঁপ আর করবে কোন্ ভরসায়?"

না, পাইকটা লাফঝাঁপ আদৌ করছে না। এক এক গেরস্ত বাড়িতে গিয়ে বসছে দু' দণ্ডের জন্য। সেটা সন্ধ্যেবেলায়। মাঠ থেকে চাষীরা ফিরলে, আর নয় ত, মাঠে গিয়ে দর্শন দিচ্ছে এক একদিন দুপুরে, মানুষগুলো যখন খুদের জাউ গিলছে সারা সকালের একটা না দুই পহর খাটনির পরে। খুদের জাউ! এক চিমটে সন্ধব নুন সহযোগে মগের মুল্লুকে ওর চেয়ে বেশী আর মিলবে কোথা থেকে?

পাইক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের দুঃখের কথা শোনে। এই যে জাউ খেয়ে ওদের এত হাড়ভাঙ্গা খাটনি, এর ফলভোগের মালিক এরা হবে না। হচ্ছে না আজ এক যুগ ধরে। ফসল ফলবে, পাকবে, সে ফসল কাটাই মাড়াই ঝাড়াই হয়ে গোলাজাত হবার সঙ্গে সঙ্গে মগের জাহাজ এসে ভিড়বে মেঘনায়, সারা ভুলুয়া পরগনা তারা টহল দিয়ে দিয়ে ফিরবে বুক ফুলিয়ে। গোলার ধান জাহাজে নিয়ে তুলবে। আর ধান যদি কেউ আগে বেচে সেরে থাকে, তার কাছ থেকে সব টাকা কেড়ে নেবে, এক ভাগ মজুরী বাবদ তাকে খয়রাত করে দিয়ে।

"তবু তোমরা চাষ করে যাচ্ছ বছরের পর বছর—" পাইকের কথায় কতখানি বিস্ময় আর কতখানি ভর্ৎসনা, তা বুঝে ওঠা শক্ত।

"না করলে হরু গোঁসাই আর নিয়ামত মোল্লা খাইবারই দিবো না আমাগর"—এর বেশী কোন কথা আর পাইক বার করতে পারে না তাদের মুখ থেকে।

কিন্তু জানতে তার বাকী রইল না কিছুই। জানিয়ে দিল (হরু গোঁসাইয়ের ভাষায়)—ঐ উনপাঁজুরে হাম্বির নস্কর। পাইক যাচ্ছিল গাঁয়ের পথে লাঠি ভাঁজতে ভাঁজতে, হাম্বিরের ডিঙ্গি বাঁধা ছিল পথের ধারের পগারে। ভুলুয়া পরগনার গাঁ ত! এশিয়ার জিনিস। প্রতি পথের ধারে পগার। সে পগার পথের চেয়ে বেশী চওড়া, তাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে। ভাঁটার জলে হাম্বিরের ডিঙ্গির মত ডিঙ্গি অনায়াসে ঘোরে-ফেরে। জোয়ারের বেলায় বড় নৌকাও ঢুকতে পারে সাহস থাকলে।

ডিঙ্গি থেকেই হাঁক দিল হাম্বির—"পাইক মশ্‌সায়, আইস্যান না. তামাক খাইয়া যান এক ছিলিম।"

তামাক? পাইক ত আকাশ থেকে পড়ল। তামাক ত ভারতবর্ষে নতুন আমদানি! এ হার্মাদ ব্যাটাদের দৌলতেই! শহরে বন্দরে শৌখিন বড়-লোকেরা সবে গড়গড়া টানতে শুরু করেছে কি না করেছে এরই মধ্যে এই ভাটি অঞ্চলে। এ ব্যাটা জেলের পো তামাক খাওয়ার নেমন্তন্ন করে পাইককে কোন্ সাহসে? ঠাট্টা ছাড়া এটা আর কিছুই ত হতে পারে না!

দাঁড়িয়ে পড়ল পাইক—"মস্‌করায় আর মানুষ পাইলা না?"

"মস্‌করা ক্যান করুম পাইক মশ্‌সায়! কাল গঞ্জে গেছিলাম। আপনের জন্যেই যোগাড় কইর‍্যা আনছি। কুঠিয়াল হুমুন্দি কি দিবার চায়? তিন কাহন বড় কই দিমু আওম খ্যাপে, এই কড়ায়ে তয় রাজী অইলো তিন ছিলিম তামুক দিবার—আইস্যান, চাইখা ছাহেম, মালডা সয়েস না নীয়েস—"

"আমার জইন্যে যোগাড়, এডা কী কও? আরে, আমি ত জন্মো-জীবনে ও-মাল চইক্ষে দেহি নাই—"

কথা বলতে বলতে পাইক কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়েও আসছে হাম্বিরের ডিঙ্গির দিকে।

দেখতে হবে ত। এ লোকটা কে? মাঠে একে কোনও দিন দেখা যায়নি। কোন বাড়ির উঠোনেও না। গাঁয়ের আবালবৃদ্ধ কাউকেই আর চিনতে বাকী নেই পাইকের এই সাত দিনে। এ লোকটা তবে ছিল কোথায় এতদিন? জানতে ত হয় পরিচয়টা—

পায়ে পায়ে ডিঙ্গিতে গিয়ে উঠল পাইক। হাম্বির—ক্ষেপে গেল নাকি দীনদুঃখী জেলেটা?

ডিঙ্গি থেকেই হাঁক দিল হাম্বির।

যতক্ষণ ডাঙ্গায় ছিল পাইক, আর নৌকায় ছিল হাম্বির, ততক্ষণ অন্তরঙ্গের মত রসিকতার আমেজ দিয়েই হাম্বির কথা কইছিল। কিন্তু ডিঙ্গিতে পাইক যেই উঠেছে।

এদিক ওদিক চারিদিক একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল হাম্বির। তারপর কেউ কোথাও নেই দেখে—

কে থাকবে কোথায় এই ভর দুপুরে? চাষীরা মাঠে, চাষী-বৌরা গেরস্তালির কাজে ব্যস্ত। গাঁয়ের পথে লোক চলাচল এমনিতেই কম, তায় আবার এই সময়টাতে!

না, কেউ কোথাও নেই। নেই দেখে কি পাইকের মাথায় এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিল হাম্বির?

আরে রামঃ! ঠিক উলটো। হাম্বির সটান হয়ে পড়ে গেল পাইকের পায়ের উপরে, আর মাথা কুটতে লাগল সেই পায়ে—"মহারাজ!

আপনি বাঁচান ছাশটায়ে। আপনি না বাঁচাইলে বাঁচাইব ক্যাডা ?"

পাইক মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—"উইঠ্যা বইস্‌সো ভাই ! ঠাণ্ডা অইয়া কও দেহি হগ্‌গোল কথা ?"

এই হাম্বির ! এরও ঘর দরোজা ছিল. জমি-জিরাত ছিল, গোলাভরা ধান উঠত আয়াম সময়। বাপ মরে যেতেই সংসার তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে, মা মরে যেতেই কনে খুঁজতে লাগল বিয়ের জন্য। ঘরে গিন্নী না থাকলে কে রাখে সংসার গুছিয়ে ?

বিয়ের সব ঠিক, এমন সময়, সেই প্রথমবার হল মগের হানা। কয়েক জাহাজ আরাকানী এল মার-মার হাঁক ছাড়তে ছাড়তে। সারা পরগনা তোলপাড় ! রাজা তখন দিল্লীতে। সেইখানে বসেই শুনতে পেলেন ভুলুয়ায় আরকানী হানার কথা। খোদ বাদশার কাছে নালিশ জানালেন তিনি। বাদশা জাহাঙ্গীর হেসে বললেন—"ও ত তোমারই দায়িত্ব। তবে তুমি যদি চাও, বাংলার সুবেদার মহাবৎ খাঁ তোমায় সাহায্য করবেন বই কি ! আমি চিঠি দিয়ে দেব—"

বাদশা চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন উপকার হল না রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের। মহাবৎ খাঁ ইতিমধ্যে করেছেন বিদ্রোহ, বাংলা ছেড়ে রওনা হয়েছেন বিন্ধ্যারণ্যের ভিতর দিয়ে রাজস্থানের দিকে। উদ্দেশ্য সাজাহানের সঙ্গে সেখানে মিলিত হওয়া। সাজাহানও তখন বিদ্রোহী, সম্রাট সৈন্যের তাড়া পেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মেবারের রানার।

সে ইতিহাস থাকুক, তার সঙ্গে এ বাহিনীর কোন সংস্রব নেই। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি সারা দেশেই এরকম অশান্ত হয়ে উঠেছে এই সব কারণে যে সুবে বাংলার সুদূরতম পূর্বাঞ্চলে আরাকানীদের লুঠপাটে দুর্ভাগা বাঙ্গালীদের যে কী রকম যমযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে, তা দেখবার মত ফুরসুৎই কারও নেই।

মহাবৎ খাঁ বাংলা ত্যাগ করে যাওয়ায় ফলে সুবেদারের আসন এখন শূন্য। নতুন লোক কে আসছেন ও-পদে, কবে বা আসছেন তিনি, সে খবরও ঢাকা শহরে জানে না কেউ। দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অবশ্য দেওয়ান আয়সাদ হোসেন। কিন্তু নিজে যেচে বৃহৎ কোন ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা করার ক্ষমতাও তাঁর নেই, আগ্রহই বা কোথা থেকে আসবে ? লক্ষ্মণমাণিক্যকে তিনি এক কথায় ঝেড়ে ফেলে দিলেন—"আমি হচ্ছি দেওয়ান মনিষ্যি, বুঝলেন রাজা, যে-অস্ত্র নিয়ে আমার কাজ-কারবার, তা হল দোয়াত কলম। তরোয়াল বন্দুক দেখলে গা সিরসির করে। আমি যে ভুলুয়া থেকে আরাকানী হানাদার তাড়াবার জন্য মস্ত একটা কিছু করব, এরকম আশাই আপনি করতে পারেন না রাজা !"

লক্ষ্মণমাণিক্য ফিরে এসেছেন কাজে কাজেই ঢাকা থেকে। কিন্তু ইন্দ্রপুর রাজধানীতেও ঠাণ্ডা হয়ে বসতে পারেননি একদিনের জন্যও। তাঁরই প্রজা তাঁরই আশ্রিত প্রভুভক্ত ভুলুয়াবাসীরা বৎসরে বৎসরে নিয়মিত ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে আরাকানীদের জুলুমে, তিনি কিছু করতে পারছেন না, রাজাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত থেকেও। এ লজ্জা রাখবার স্থান কোথায় তাঁর ? বীরবংশে কি জন্ম নয় তাঁর ?

আজ কয়েক বৎসর ধরে রাজধানীতে অনেক কিছু তোড়জোড় করে যাচ্ছেন লক্ষ্মণমাণিক্য। ভ্যান হোডেনকে পেয়েছিলেন দিল্লীতে। লোকটা ওলন্দাজ। সে হল পেশায় মিস্ত্রী। তবে যা-তা মিস্ত্রী নয়, জাহাজ তৈরির মিস্ত্রী। ভুল খবর পেয়ে

সে দিল্লীতে এসেছিল, বাদশা কোন সামুদ্রিক বন্দরে জাহাজ তৈরীর কারখানা বসাবেন, এই আশায়। এসে দেখে সে-রকম কোনই মতিগতি জাহাঙ্গীর বাদশাহের নেই। হতাশ হয়ে সে দেশে ফিরে যাবে ভাবছিল, এমন সময় লক্ষ্মণমাণিক্যের নজরে পড়ল সে। তিনি তাকে এনে ইন্দ্রপুরে কারখানা খুলে দিলেন, জাহাজ তৈরীর। বেশী বড় নয় কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয় ধাঁচের জাহাজ।

তেমনি তিনি কামান তৈরীর কারখানাও বসিয়েছেন ইন্দ্রপুরে। এর জন্য ভ্যান হোভেনই হল্যাণ্ড থেকে আনিয়ে দিয়েছে ওস্তাদ কারিগর এব্রিকসন নিকলসনকে। ভুলুয়ার কয়েক শো বাছাই বাছাই পাইক গোলন্দাজী শিক্ষা করছে ফরাসী সেনানী ফ্রাঁসোয়া কুর্ভিলের কাছে।

তোড়জোড় ওদিকে হতে থাকুক, লক্ষ্মণমাণিক্য বেরিয়েছেন সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং আরাকানী চর গোয়েন্দাদের দুষ্ট চক্রের উচ্ছেদ মানসে। এক এক গ্রামে তিনি যান, দশ বারো দিন ঘোরাফেরা করেন, তারপর তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন দল বেঁধে আসে রাজার পাইকেরা। হরু গোঁসাই আর নিয়ামৎ মোল্লা জাতীয় বেইমানদের ধরে নিয়ে যায় শিকলে বেঁধে। তারা পচে মরতে থাকে ইন্দ্রপুরের কয়েদখানায়।

গ্রামে গ্রামে তিনি ঘোরেন, প্রজারা কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। কী করে পারবে? গরিব চাষী এরা, রাজধানীতে ত যায় না। আর লক্ষ্মণমাণিক্যের আগে কোন রাজাও কোনদিন ত কাদায় ডোবা সাপ কুমীরের রাজ্য পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদার্পণ করেননি, প্রজাদের দুর্গতি নিজের চোখে দেখবার জন্য।

তবে হাম্বির নস্করের কথা আলাদা। চাল-চুলোহীন মানুষটি মেছো-ডিঙ্গি বেয়ে বেয়ে না গিয়েছে হেন জায়গা নেই ভুলুয়া রাজ্যে। ইন্দ্রপুরেই সে দেখেছে রাজাকে। রাইয়ে থেকে দেখেছে জাহাজ কারখানা, কামানের কারখানাও, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে ওগুলো কী। ভিতরে ঢোকার অনুমতি ত ছিল না তার।

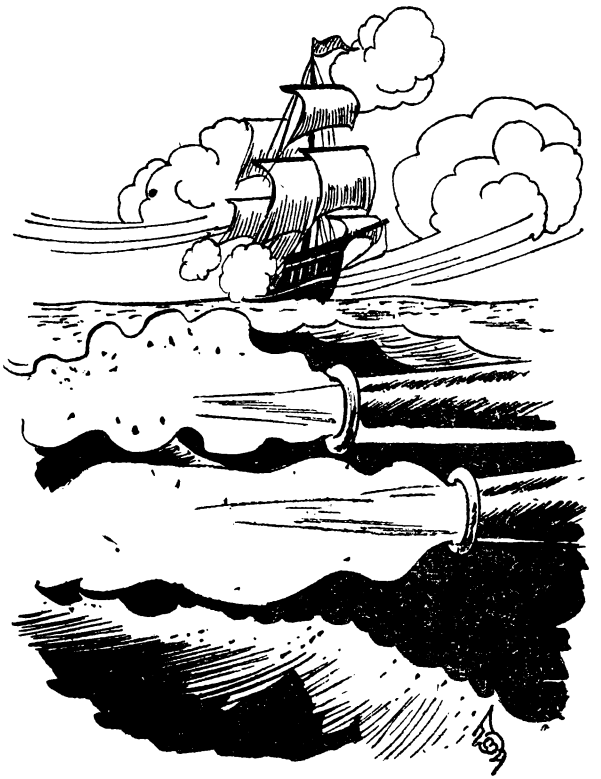

বাঙ্গালী গোলন্দাজের হাতে বজ্রনাদে গর্জে উঠল কামান। [পৃষ্ঠা ৩৪৬

আজ পাইকবেশে লক্ষ্মণমাণিক্যকে সোঁদলা গ্রামের পথে পথে ঘুরতে দেখে সে অসম সাহসের কাজ করে বসেছে, রাজার পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠেছে—"বাঁচাও রাজা। তোমার প্রজাকে তুমি না বাঁচালে কে বাঁচাবে?"

অনেক কথাই ডিঙ্গির গলুইয়ে বসে শুনলেন এবং বললেন লক্ষ্মণমাণিক্য। হাম্বীর নস্কর মিছিমিছিই মেঘনা, পদ্মা, শীতলাক্ষ, ধলেশ্বরীর বুকে ডিঙ্গি বেয়ে বেড়ায় না। মাছ সে ধরে, মাছ সে বেচেও বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে মগেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার। রাজাকে

সে বলল—"হাজার জেলে ডিঙ্গি দু' হাজার জেলে! এ আমি যে-কোনদিন তোমায় এনে দিতে পারি রাজা! কিন্তু জাহাজের সঙ্গে লড়াই, কামানের মোকাবিলা, সে ত ডিঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সড়কি ছুঁড়ে করা যায় না।"

"জাহাজ, কামান আমি দেব মুখোমুখি লড়াই তারাই দেবে। তোমরা শুধু পিছনটা আগলাবে, যাতে একটা মগের বাচ্চাও নিজের দেশে ফিরতে না পারে।"

তাই হল। সেবার যখন আরাকানী জাহাজ-খানা মেঘনা থেকে পদ্মায় ঢুকল, নিঃশব্দে মেঘনার উজান থেকে বেরিয়ে এল কয়েক হাজার জেলে-ডিঙ্গি, আচ্ছন্ন করে ফেলল মেঘনার জল ওদিকে সামনে আরাকানীরা দেখল এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। খাঁটি ইউরোপীয় জাহাজ দুই দুইখানা, কামান সাজানো তার উপর ডেকে। গুড়ুম-গুম-বুম-বুম! বাঙ্গালী গোলন্দাজের হাতে বজ্রনাদে গর্জে উঠল সেই সব কামান।

যুদ্ধ হল বই কি! কিন্তু আরাকানীরা এর জন্য প্রস্তুত ত ছিল না! তাদের খোঁজারুরা কেউ কোন খবরই দেয়নি যে, এমন ভয়ঙ্কর ফাঁদ তাদের জন্য এবার পাতা হয়েছে ভুলুয়ায়। খবর দেবে কী করে? সব খোঁজারুই যে ইন্দ্রপুরের কয়েদখানায় ঘানি টানছে কয়েক মাস থেকে!

যে-পথ দিয়ে এসেছিল মগেরা, সে-পথ দিয়ে আর ফিরল না তারা। মগদস্যুর অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হল পূর্ববাংলায়।

জর্জ স্টিফেনসন

রেলপথের উদ্ভাবক এবং বাষ্পীয় যানের আবিষ্কর্তা জর্জ স্টিফেনসনের জন্ম হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। নিউক্যাসন-অন-টাইন-এর নিকটবর্তী উইলাম গ্রামে। পিতা ছিলেন দরিদ্র খনি-শ্রমিক, কাজেই পুথি-কেতাবের শিক্ষা পুত্রকে কিছুই দিতে পারেন নি। চৌদ্দ বছর বয়সে জর্জ এক কয়লার খনিতে চাকরি নিলেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল জলের পাম্প চালানো।

এর পর এক দায়িত্বশীল পদ তিনি লাভ করলেন কিলিংওয়ার্থ কলিয়ারিতে। সেখানকার যাবতীয় যন্ত্রপাতি তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হ'ল তাঁর উপরে। যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চর্চা করার সুযোগ এই ভাবেই পেয়েছিলেন তিনি।

ঐ কলিয়ারির হাতার মধ্যেই কয়লা বহনের জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় শকট নির্মাণ করেন স্টিফেনসন, সে-শকটের নামকরণ হয়েছিল "ব্লুকার"। এর পর একটার পরে একটা রেলপথ নির্মাণ ও রেল-ইঞ্জিন গঠনের ভার তাঁর উপরে অর্পিত হতে লাগল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর হাতে-গড়া ইঞ্জিন "রকেট" ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিবেগ প্রদর্শনে সক্ষম হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুর-ম্যাঞ্চেস্টার রেলপথ পৃথিবীর প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন টেনে নিয়ে গেল স্টিফেনসনেরই ইঞ্জিন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় জর্জ স্টিফেনসনের।

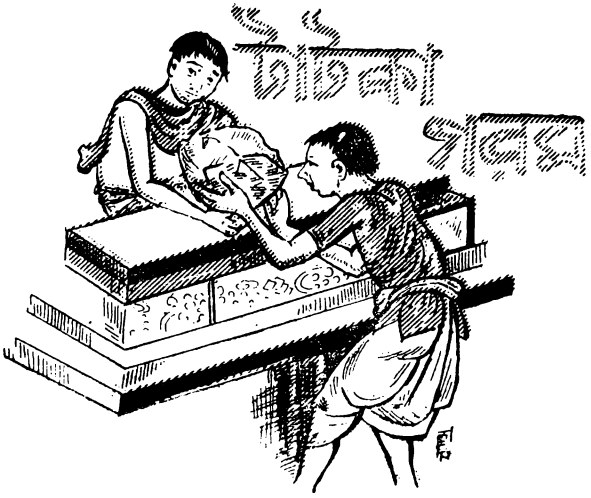

হাসিরাশি দেবী

ওহে ও দোকানদার, গরম কি আছে আর ?
দাও দেখি ঠোঙা ক'রে ভরতি,
কি দিয়েছ,—চম্‌চম ! নিম্‌কি ? আলুর দম ?
চাটনীও আছে একরত্তি !
জিভে গজা দাও কিছু, আরও কিছু মাল্‌প'—
বিয়ে ভাজা কচুরিও দিয়ে রাখ' অল্‌প ;
কিছু দাও লেডিকেনী কিছু দাও সন্দেশ,
ছানাবড়া,—বালুসাই, মিহিদানা দরবেশ,
আর দাও সীতাভোগ, খাস্তা যা কিছু হোক
লাড্ডু ও মতিচুর, জিলাপী ও রাবড়ী
ঠোঙা ভ'রে দিয়ে দাও, ধীরে ধীরে চাপড়ী ;
যেন কিছু পড়ে নাক',—যেতে হবে বাড়িতে,
বাসে, রিক্সায় আর রেলে চড়া গাড়িতে ;
হেঁটে হেঁটে এরপর। পৌঁছাতে দুপহর ;
এখন কয়টা বাজে ? বড়জোর সাতটা—?
ভেবে ভেবে কাটিয়েছি কালকের রাতটা।'

কই ভাই, দিয়েছ তো সবগুলো গুছিয়ে ?
এই নাও সব দাম, দিয়ে যাই বুঝিয়ে ;
কুটুম আসবে ভাই, গরম-গরম তাই
বাড়ি ফিরে খেতে দেব,—এইটাই সুবিধে,
কি ভাই দোকানদার,—পারলে না বুঝিতে ?

——

কামার পুকুরে ছেলে কোলে নিয়ে মা চন্দ্রমণি ও কয়েকজন পল্লীনারী
রোজ ভাবি আর আসব না। কিন্তু সকাল হলেই মনটা আমার জন্যে উসখুস করে
চন্দ্রাদি, তোমার ছেলে আমাদের টেনে আনে। কালো ছেলের কি টান গো!
চন্দ্রমণি ও ক্ষুদিরাম
খোকা দেখতে দেখতে এক বছর হল, গরুর দুধের কি হবে?
ভেবনা গিন্নী, গদাই আমাদের সংসার গোবর্ধন। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন।
এমন সময়-
ঠাকুর মশাই বাড়ি আছেন
কে ভেতরে এস।
মেদিনীপুর থেকে আপনার ভাগ্নে গরুটা পাঠিয়ে দিলেন খোকার দুধের জন্য
বাবা, তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, মুখ-হাত ধুয়ে জল খাবে এস।

ক্ষুদিরামের বাড়ী। তিন বছরের গদাই কোলে দু'তিনজন মহিলা
ধনী, তুই কামারের বউ হলেও খুব ভাগ্যবতী, তুই তো একে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করলি
দিদি, ছেলে আমাদের কেষ্ট ঠাকুর
ক্ষুদিরামের সঙ্গে গদাই
গদাই তোমায় রামায়ণের গল্প বলেছিলাম, মনে আছে?
হ্যাঁ বাবা, বলব?
কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি
গদাই সব হুবহু বলে গেল
জানিস, আমাদের গদাই, আমাদের পাঠশালায় যাবে
কাল তার হাতে খড়ি হয়ে গেছে
পাঠশালায় গদাই। অল্প পড়তে ও লিখতে শিখেছে
৬
গদাই লিখছে; কিন্তু লেখাগুলি তার কাছে ধাঁধাঁ লাগছে, মাথা ঝন-ঝন করছে

(ক্রমশঃ)

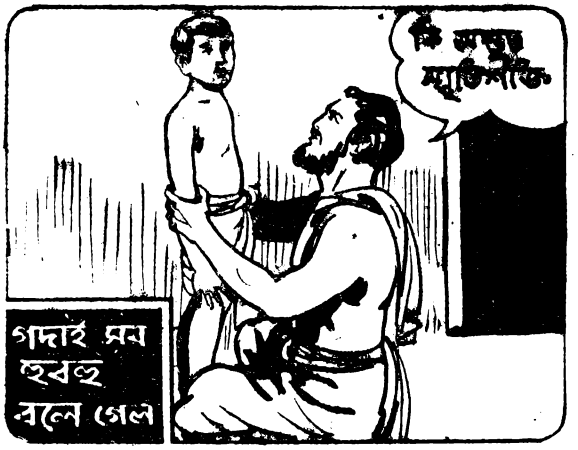

গেলে সে চাঁদের রাজ্যে

বন্দে আলী মিয়া

অনেক দিন আগের কথা। দু'জন লোক কিউয়াই দ্বীপে বাস করতো। একদিন তাদের মধ্যে চাঁদ আর সূর্যকে নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছিলো।

প্রথম জন বললো : দেখ, চাঁদ আর সূর্যের কথা যে বলছো, ওরা দুটো আলাদা, কখনো এক নয়।

দ্বিতীয় জন জবাব দিলো : না গো, তা নয়। চাঁদ আর সূর্য হচ্ছে এক। ওরা দুটিতে মিলে একটি জিনিস।

কেউ কারো কথায় বিশ্বাস করলো না। দু'জনার মধ্যে তুমুল তর্ক চলতে লাগলো। তর্ক হতে হতে শেষে মারামারি শুরু হলো। দ্বিতীয় লোকটি এমনভাবে প্রথম লোকটিকে আঘাত করলো যে তাতে সে মাটির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সে আর এক মিনিটও সেখানে দাঁড়ালো না। সামনের দিকে চলা শুরু করলো।

প্রথম লোকটি কিছুক্ষণ মাটির ওপরে পড়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। সে মনে মনে ভাবলো, এখন আর গ্রামে ফিরে যাওয়া চলবে না। গ্রামে গেলেই তার চেনা লোকজন আর বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকবে। মারামারি করতে গিয়ে সে যে হেরে গেছে এ খবর নিশ্চয় সে এতক্ষণে পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে। দারুণ লজ্জায় পড়বে সে। নাঃ, এখন গ্রামে যাওয়া তার চলবে না। তাই সে সমুদ্র যে দিকে আছে সেই পথ ধরে রওনা হলো। চলতে চলতে সে গিয়ে হাজির হলো সমুদ্রের ধারে। সেখানে একখানি ছোটো নৌকা বাঁধা ছিলো। সে সেই নৌকাতে উঠে বসলো, তারপর নৌকাটা ছেড়ে দিলো। সমুদ্রে তখন জোয়ার এসেছিলো। নৌকাটা জোয়ারের স্রোতে ভেসে চললো।

নৌকায় বসে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, সে এই নৌকায় চেপে চাঁদের দেশে চলে যাবে। নিজের চোখে দেখে আসবে, চাঁদ আর সূর্য একজন না দু'জন।

নৌকা চালিয়ে সে চলে যেতে লাগলো। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে সেই অথই সমুদ্রে নৌকা চালাতে লাগলো। কয়েক দিন একটানা চলবার পরে নৌকাটা একটা বালির চরায় গিয়ে আটকে গেল। কিউয়াই দ্বীপের মানুষটি সেই নৌকার উপরে বসে আশে-পাশে চারদিকে তাকাতে লাগলো। সে ভাবতে লাগলো, এটা যদি চাঁদের দেশ তবে সেই চাঁদমামা—যাকে 'গানুমি' বলা হয়, সে কোথায়!

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'গানুমি' এসে হাজির হলো। সে সময়টা কৃষ্ণপক্ষ ছিলো বলে গানুমিকে ছোট্টো একটি ছেলের মতন দেখাচ্ছিলো।

গানুমি কিউয়াই দ্বীপের লোকটিকে বললো: তুমি যে সাত সুমুদ্দুর পার হয়ে চাঁদের রাজ্যে এসেছো, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন দয়া করে নৌকা থেকে নেমে এসো।

কিন্তু লোকটি সেই ছোট্টো ছেলেটিকে চাঁদমামা বলে বিশ্বাস করতে পারলো না। তাই সে বললো: গানুমি নিজে এসে নিমন্ত্রণ না করলে আমি নৌকো ছেড়ে কোথাও যাবো না।

— গানুমি জবাব দিলো: আমার নাম গানুমি—আমিই চাঁদ।

কিন্তু তবুও কিউয়াই দ্বীপের লোকটি তার কথা বিশ্বাস করলো না অথবা নৌকা থেকেও নেমে গেল না। সে তার সেই ছোটো নৌকার মধ্যেই বসে রইলো। নৌকাতেই তার দিন কাটতে লাগলো।

ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের কয়েকটি রাত কেটে যেতেই চাঁদ ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠলো। এখন গানুমি বেশ বড়ো সড়ো হয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে একটি যুবকের মতো। গানুমি এই সময়ে সেই নৌকার লোকটির কাছে এসে দাঁড়ালো। নৌকার লোকটি এবারেও তাকে 'চাঁদামামা' বলে বিশ্বাস করতে পারলো না। সে নৌকা থেকে নামলো না। গানুমির ডাকেও সে সাড়া দিলো না।

চাঁদামামা এই ভাবে সেই কিউয়াই দ্বীপের লোকটির কাছে তিনবার যাওয়া আসা করলো। প্রতিদিনই সে আগের চেয়ে আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিলো। তবুও সেই লোকটি তাকে গানুমি বলে বিশ্বাস করলো না।

দিনে দিনে চাঁদামামা বড়ো হয়ে উঠছিলো। কয়েক দিনের মধ্যেই সে প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো। মাথার চুলগুলো তার সাদা হয়ে গেল। বয়স খুব বেশী হওয়ায় দেহটা তার কুঁজো হয়ে পড়লো। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে সে হাঁটতে লাগলো। তেমান ভাবে ঠুকঠুক করে সে এলো কিউয়াই দ্বীপের সেই লোকটির কাছে।

এবার তাকে দেখে গানুমি বলে তার বিশ্বাস হলো। লাঠি ঠুকঠুক করে চলা বুড়োকে দেখেই লোকটি বলে উঠলো: এত দিনে সত্য সত্যই চাঁদামামার সাক্ষাৎ পেলাম।

এই কথা বলেই লোকটি নৌকা থেকে নেমে এসে গানুমির পাশে দাঁড়ালো।

গানুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল। বাড়ির চারপাশ তাকে দেখাতে লাগলো। বললো: এই সাদা ধবধবে যা কিছু দেখছো সবই আমার। আমার বাড়ি সাদা, আমার বাগান সাদা, আমি যা কিছু খাই তার সবই সাদা।

তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির অন্য দিকে গেল।

সেই দিকের সকল জিনিস দেখিয়ে বললো: এই দেখ, এ দিকের সব কিছুই কালো। এখানকার বাড়ি ঘর কালো। খাবার-দাবার জিনিসও কালো। এই জিনিসগুলো অমাবস্যার সম্পত্তি। অমাবস্যাকে সকলেই 'হুও' বলে জানে। এখানের সবকিছু 'হুও'র জিম্মায় রয়েছে।

—এই যে দড়িটা দেখছো এটাও সেই চাঁদের। [পৃষ্ঠা ৩৫৩

সর্বশেষে গানুমি তাকে নিয়ে গেল বাড়ির অপর এক দিকে। সেখানে সকল জিনিসের রঙ সিঁদুরের মতন লাল।

গানুমি সেই জিনিসগুলো দেখিয়ে বললো: এই সকলের মালিক সূর্য, তাই এদের রঙ এমন লাল।

তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সে খাবার ঘরে গেল। দুজনে একত্রে বসে কিছু খাবার খেলো।

গানুমি বললো: এবারে আমার আকাশে যাবার সময় হয়েছে। দুনিয়ার চারদিকে জলে স্থলে আলো পৌঁছে দিতে হবে।···এই কথা বলে সে একটা মস্ত বড়ো গাছে উঠে গেল। তারপর নীল আকাশের দিকে ঝাঁপ দিলো। এক টুকরো মেঘের ওপরে সে পা ছোঁয়ালো। অমনি সারা আকাশটা আলোতে ঝলমল করে উঠলো।

গানুমির কাজ দেখে কিউয়াই দ্বীপের লোকটি খুব কৌতুক বোধ করলো। সে সারারাত্রি জেগে চাঁদের দিকে চেয়ে বসে রইলো। মনে মনে সে বলতে লাগলো এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি, আমিই ঠিক কথা বলেছিলাম, সূর্য আর চাঁদ সম্পূর্ণ পৃথক্। আমাদের দ্বীপের যে লোকটি বলেছিলো চাঁদ আর সূর্য এক, সে ভুল বলেছিলো।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। ঠিক ভোরের সময়টিতে চাঁদামামা ফিরে এলো তার নিজের ঘরে।

ঘরে এসে সেই কিউয়াই দ্বীপের লোকটিকে বললো: এবারে চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমার দেশে। যাবার সময়ে এ দেশের কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার কাছে থেকে কিছু সাদা খাবার নাও। অমাবস্যা মানে 'হুও'র কাছ থেকে কিছুটা কালো খাবার নাও। সিঁদুর রঙের লাল খাবারগুলো নাও সূর্যের কাছ থেকে। যখন তুমি দেশে গিয়ে পৌঁছুবে তখন গ্রামের লোকেরা আর বন্ধু-বান্ধবেরা আসবে। তারা জিজ্ঞাসা করবে এমন রকম রকম খাবার কোথায় পেলে।

এই কথা বলে গানুমি খাবারগুলো সংগ্রহ করে তাকে দিলো, তারপর একটা লম্বা দড়ি ঘর থেকে বের করে আনলো। দড়ির একপ্রান্ত নিজের হাতে রাখলো, অপরপ্রান্ত সেই কিউয়াই দ্বীপের লোকটিকে ধরতে দিলো। দিয়ে বললো: তুমি দড়ি ধরে নেমে যখন তোমার গ্রামে গিয়ে পৌঁছুবে তখন দড়ি ধরে খুব করে ঝাঁকুনি দেবে। তাহলেই আমি বুঝতে পারবো তুমি নির্বিঘ্নে নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁচেছো।

তারপর দড়ির একপ্রান্ত হাতে নিয়ে গানুমি আকাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। শূন্য পথে ঘুরতে ঘুরতে যখন কিউয়াই দ্বীপের উপরে এসে থামলো,

লোকটির নৌকাখানিও ততক্ষণে গ্রামের ঘাটে এসে পৌঁচেছে। নৌকাটা ঘাটে বেঁধে সে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলো।

গ্রামের লোকেরা খবর পেয়ে সবাই দৌড়ে এলো সমুদ্রধারের সেই লোকটিকে দেখবার জন্যে, যে চাঁদের দেশে পাড়ি দিয়েছিলো। লোকটি গ্রামের সবাইকে দেখে খুব খুশী হলো। সে তাদের দেখাতে লাগলো তিন রঙের নানান রকম খাবার। তাদের কাছে দিন রাত্রি আর চাঁদ সূর্য সম্পর্কে অনেক কথা বলতে লাগলো।

হাতের সেই দড়িটা সবাইকে দেখিয়ে বললো: এই যে দড়িটা দেখছো, এটাও সেই চাঁদের। সে আমাকে দড়িতে ঝুলিয়ে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। তোমরা সবাই দেখ, দড়িটা ছেড়ে দিলে গামুমি সেটা টেনে নেবে।

এই কথা বলে সে দড়িটা ছেড়ে দিলো। দড়ি অমনি আকাশে উঠে গেল। সকলে অবাক্ হয়ে উপরের দিকে চেয়ে রইলো। দড়িটা আকাশে মিলিয়ে গেলে তারা সকলে মিলে সুখ্যাতি করতে লাগলো যে লোকটি চাঁদের দেশ থেকে ফিরে এসেছে তার। তারপর সবাই মিলে তার জন্যে মস্ত বড়ো একটা ভোজের আয়োজন করলো। সেই ভোজে চাঁদের দেশ থেকে আনা সাদা ধবধবে খাবার, অমাবস্যার কাছে থেকে আনা কালো কুচকুচে খাবার আর সূর্যের কাছে থেকে আনা লাল টুকটুকে খাবারের একটু একটু করে স্বাদ নিতে লাগলো সবাই।*

* পাপুয়া দেশের লোক কাহিনী।

ফাঁড়া

অনিরুদ্ধ সিংহরায়

কাল গেল এক ফাঁড়া,
মাসী বাড়ি যাবার তরে,
বুট লাগিয়ে টাই দুলিয়ে,
বাসের লাগি কালীঘাটে
দাঁড়িয়েছিলাম খাড়া।
আচম্বিতে পিছন ফিরে
বিরাট বিরাট শিঙ না নেড়ে;
হঠাৎ এক শিবের বাহন
করল মোরে তাড়া।
ঘণ্টা খানেক ছোটার পরে
ট্রাফিক পুলিস থামায় মোরে;
তাকিয়ে দেখি, আরে
এ যে আমার মাসীর পাড়া।
মনে মনে হিসাব কষি
বহুত আমি হলাম খুশী,
বাঁচল আমার ষাট পয়সা,
পাক্কা বাসের ভাড়া॥

সব্যসাচী

২

টারজান তখন কোথায় ?

তা বেশ খানিকটা তফাতে। পাশা আর হকিম তাকে অদৃশ্য হতে দেখেছিল একটা পাথরের ঢিবির আড়ালে। শুধু হাতে নয়, হতজ্ঞান নায়কুণ্ডার আধ-পোড়া দেহটা কাঁধে ছিল তার।

ঢিবি ওখানে অনেক, উপত্যকার ঐ অংশটাতে। তাদেরই ভিতর দিয়ে দিয়ে এঁকে বেঁকে তীরবেগে ধেয়ে চলেছে টারজান। মাইল খানিকের মাথায় পাহাড়ের একটা লাইন। গতি তার সেই দিকে। এ-জায়গায় আগে কোনদিন আসেনি ও, আসবার কোন দরকার পড়েনি। ওর স্বাভাবিক চারণভূমি হল অরণ্য, পাহাড় বা পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকা। এসব জিনিস তেমন রুচিকর নয় তার কাছে।

না, টারজান আগে কখনো আসেনি এদিকে। তবে জানা ছিল এর হালহদিস কতকটা। মহা-বনস্পতিদের মগডালে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখে যখন এই প্রকৃতির সন্তান, তখন দূর অঞ্চলের ভূ-সংস্থান ত আপনা থেকেই চোখে পড়ে তার! সেইভাবেই ও ভাসা-ভাসা-রকম পরিচিত হয়েছে এই উপত্যকা আর ঐ পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গে। একদিন ঐ পাহাড়ের ভিতরে এক পাল বুনো ছাগলকে সে ঢুকে যেতে দেখেছিল। অবশ্যই ছাগলেরা কোন গুহার সন্ধান পেয়েছে ওখানে। সেই গুহাতেই ছাগলদের অতিথিরূপেই নায়কুণ্ডাকে কায়েম করবার বাসনা টারজানের। পাহাড় ন্যাড়া নয়, সবুজের সমারোহ তার সারা অঙ্গে, সুতরাং মুলাংমুচকো ওখানে থাকবেই থাকবে।

অনুমান মিথ্যে নয় ওর। পাহাড়ে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা মাঝারি আকারের গুহা তার চোখে পড়ল, মাটি থেকে অন্ততঃ ফুট দশেক উপরে। সে দশ ফুট বেয়ে উঠবার কোন পথ নেই। তা ছাগলদের পথ লাগে না পাহাড়ের গায়ে চলাফেরা করতে। এক ইঞ্চি পরিমাণ একটু আলসে পেলে, তারা খাড়া দেওয়ালের গায়ে আরামে দাঁড়িয়ে পাতালতা চিবোতে পারে। হ্যাঁ, ছাগলে পারে, আর পারে টারজান। পাতালতা

সে চিবোয় না, চিবোয় হরিণের কাঁচা মাংস। তা হরিণ শিকারের জন্য ঐ রকম আলসে অবলম্বনে মাঝে মাঝে তাকে রেস দিতে হয় বই কি।

কাজেই নারকুণ্ডাকে কাঁধে নিয়ে গুহায় উঠতে তেমন কিছু বেগ পেতে হয়নি টারজানকে। গুহার ভিতরটা শুকনো খটখটে। সমতল অবশ্য নয়। তা তাতে আর হয়েছে কী? একটা মানুষকে শোয়াতে জায়গা দরকার ত মোটে ছয় ফুট লম্বা, দুই ফুট চওড়া। দরোজা-বরাবর সেই পরিমাণ একটু জায়গা পা দিয়ে দিয়েই পরিষ্কার করে ফেলল টারজান, নারকুণ্ডাকে শোয়াল সেইখানে। একটা জিনিস দেখে সে পুলকিত হয়ে উঠল, গুহার কোণে একটা সরু জলধারা বয়ে যাচ্ছে প্রায় নিঃশব্দে। একদিকের দেয়াল ফুটো করে ঢুকেছে গুহায়, আর একদিকের দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছে, কোন্ অজানায় তা কে জানে।

কিন্তু থাকুক এখন জলের ধারা, মুলাংমুচকোর জন্যই তাকে ছুটতে হল তখুনি। এক বোঝা পাতা নিয়ে গুহায় ফিরতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগল না টারজানের। পাথরে থেঁৎলে তার রস বার করতে আর এক মিনিট। তারপর সেই রস অসীম দরদের সঙ্গে সে সর্বাঙ্গে মাখাতে লাগল নারকুণ্ডার, যাকে নাকি নরকের কীট, খুনে ঘাতুক বলে বর্ণনা করেছে পাশা-হকিম কোম্পানি।

মিনিট দশেক? অতক্ষণও নয় বোধ হয়। পরিচিত মেঘমন্দ্র গর্জে উঠল উপত্যকার দিকে। ন্যুমা মহারাজ শিকার দেখতে পেয়েছেন। লাফ দিয়ে তাকে পাকড়াবার আগে এই রকম একটা গর্জন করা চিরকেলে স্বভাব মহারাজের। বোধ হয় শিকারকে ভয়ে আড়ষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যেই।

ভাঙ্গা প্লেনে একশোটা মৃতদেহ থাকবার কথা। কিন্তু প্রথম কথা, নিজে যাকে মারেনি,

একটা সরু জলধারা দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছে।

এমন শিকার মুখে তোলে শুধু সেইসব সিংহেরা, যারা অতি শিশু বা অতি বৃদ্ধ, শিকার ধরবার শক্তি যাদের হয়নি এখনো, বা বিলুপ্ত হয়েছে বয়োঃধর্মে। না, ভাঙ্গা বিমানের বিভিন্ন খণ্ডে যে সব মড়া পড়ে আছে, তাদের উপরে তাক নয় এই গর্জমান পশুরাজের। এর লক্ষ্য সেই তিন নির্বোধ জ্যান্ত মনুষ্য, টারজান দরোজা খুলে দেওয়া সত্ত্বেও যারা খাঁচা থেকে বেরোয়নি।

বেরোয়নি, কেন না কিছু দামী মালপত্র নাকি আছে খাঁচায়, যা ফেলে চলে আসা চলবে না।

সে কথা স্মরণ করে এখন ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল টারজানের। আগলাও এখন দামী মাল!

রক্ত-মাংসের দেহটা উদরে যেতে পারে ন্যুমার, হাড়গোড় কিছু-না-কিছু অবশিষ্ট থাকবেই থাকবে হীরে জহরত আগলাবার জন্য।

হাসতেই যাচ্ছিল টারজান, কিন্তু ফুটবার আগেই সে-হাসি মিলিয়ে গেল ঠোঁটের কোণে তিন তিনটে মানুষ ঐ ভাঙ্গা প্লেনের টুকরোটাতে। তাদের আশেপাশে গর্জাচ্ছে ক্ষুধার্ত ন্যুমা। ভোজ্য আর ভোক্তার মধ্যে অন্তরাল শুধু একখানা অ্যালুমিনিয়ামের চাদর। সে-চাদর যথেষ্ট মজবুদ, তাতে সন্দেহ নেই। দুই চার মাইলের ঊর্ধ্বাকাশ থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেও প্লেনের ধাতব আবরণ চিড় খায় না। ন্যুমাও পারবে না সে আবরণ ভেদ করতে। চিন্তা করবার কিছু নেই ঐ অভাগা তিনটির জন্য।

নিজেকে আশ্বাস দিতে গিয়েও টারজান কিন্তু মনে তেমন জোর পাচ্ছে না। গায়ের জোরে না পারুক, কৌশলে তা পারতেও পারে পশুরাজ। ওরা যে কত ধূর্ত, তা টারজানের চেয়ে বেশী কে জানে আর? ন্যুমা-স্যাবর-সীটার সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই ত ওর শৈশব থেকেই চলছে। ধাইমা মহাবানরী কালার কোল থেকে নেমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে যেদিন, বলতে গেলে ত সেইদিন থেকেই। বুদ্ধিবলে ন্যুমারা যে কোন দিন টারজানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি, সে শুধু এই কারণে যে টারজানের কোন দিন ভয় ডর বলে কোন বস্তু ছিল না। কিন্তু মানুষের সমাজে এমন প্রাণী আর কে আছে, যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে, "আমারও নেই ভয় ডর?" নেই, কেউ নেই। এমন মানুষ টারজান ছাড়া কেউ নেই দুনিয়ায় যে, ন্যুমাকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার করতে দেখলেও নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে পারে তার আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য।

কেউ নেই তেমন লৌহহৃদয় পুরুষ দুনিয়ায়। খাঁচায় বন্দী ঐ লোক তিনটিও নয় তেমন নিশ্চয়ই। ঐ যে গর্জন আকাশ পাহাড় এখনও গমগম করছে যার প্রতিধ্বনিতে, সেটি শুনবামাত্রই ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে নিশ্চয়, ন্যুমা যদি খাঁচার দরোজা খুলতে পারে কোন কায়দায়, ওদের সাধ্য হবে না আত্মরক্ষার।

মুলাংমুচকোর রস আপাদমস্তক মাখানো হয়ে গেল। এইবার আস্তে আস্তে নায়কুণ্ডার জ্ঞান ফিরে আসবার কথা ফিরবে যখন, ওকে কিছু খেতে দেওয়ার দরকার হবে। চিন্তার কথা। খাদ্য হোক বা অন্য কোন বস্তু হোক, পর্যটনকালে কোন সঞ্চয় কাছে রাখার স্বভাব নয় টারজানের। আজ সকালে বাওবাব গাছ থেকে নেমে একটা হরিণ শিকার করেছিল ও। গাছে উঠে তার বারো-আনা পরিমাণ মাংস নিজের উদরেই প্রেরণ করেছে। বাকী চার-আনা সঙ্গে সঙ্গেই নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল প্রসাদাভিক্ষু চিতাটার সামনে। চিতাদের ও ডাকে সীটা বলে। টারজান যখন যে বনে যাক, সীটারা দুই একটা তার পিছনে সর্বদাই থাকে। জানে যে বনের রাজা অনুরক্ত প্রজাদের প্রসাদকণিকায় বঞ্চিত করবে না।

যে কথা হচ্ছিল। সঞ্চয় কিছু নেই, কোন খাদ্যেরই না। অথচ এই অসহায় মৃতপ্রায় লোকটাকে খাওয়াবার ভার এসে পড়ল টারজানেরই উপরে। হরিণ মায়া সোজা বটে, কিন্তু সময়সাপেক্ষ। তার উপরে সমস্যা একটা, টারজানের মত কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাওয়া এ লোকটার পক্ষে সুস্থ অবস্থাতেও নিশ্চয়ই সম্ভব হত না, এখন যমের দোরে দাঁড়িয়ে তা যে ও পারবে, এমন ত কল্পনাই করা যায় না। ওকে খাওয়াতে হলে মাংসটার শুরুয়া করা দরকার। কী করে

কী করতে হয়, তা অবশ্য জানে টারজান। মাঝে মাঝে সভ্যদেশে যখন তাকে আবির্ভূত হতে হয় লর্ড গ্রেস্টোকের ভূমিকায়—

অতি অকস্মাৎ এ-চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল টারজানের। দ্বিতীয়বার পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন। এবার আগে পিছে দুটো ডাক, স্পষ্টতঃই দুটো জানোয়ার একত্র হয়েছে দুরধিগম্য শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য। যৌথভাবে শিকারের চেষ্টা সিংহসমাজে খুবই চালু আছে, একথা টারজান বিলক্ষণ জানে।

একটা গুলি ঐ গর্জনের পিঠ-পিঠ। তারপর আরও একটা।

গু—লি? বন্ধ খাঁচার ভিতর ওরা গুলি চালাবে কেন? পাগল হয়ে গেল নাকি ভয়ে?

বন্ধ খাঁচায় গুলি? কারণটা হঠাৎ স্পষ্ট বুঝতে পারল টারজান। খাঁচা আর বন্ধ নেই। নেই বন্ধ! ঐ শয়তান সিংহগুলো দরোজা খুলে ফেলেছে খাঁচার। কী করে? কী করে? টারজান তুলেছিল তার দু' দু'খানা হাত আছে বলে। যমদণ্ডের মত বাহুদণ্ড দু'খানা। তাই গায়ের জোরে টেনে তুলেছিল নুয়ে-পড়া ছাদটা। গায়ের জোর অবশ্য ন্যুমা-স্যাবরেরও কম নেই। কিন্তু তারা টানে কী দিয়ে? সিংহের ত হাত নেই, আছে চারখানা পা। পা দিয়ে কেমন করে ওরা টেনে তুলল ভাঙ্গা ছাদ?

কিন্তু যে ভাবেই হোক, টেনে যে তুলেছে, তাতে ভুল নেই। দরোজা খুলে গিয়েছে, এবং সেই খোলা দরোজার ভিতর দিয়ে ওরা রাইফেল চালিয়েছে প্রবেশার্থী হানাদার যুগলকে লক্ষ্য করে। যুগল? তাতে সন্দেহ নেই আর টারজানের। গর্জন কি দুটো সিংহেরই শোনা যায়নি?

এখন তাহলে টারজানের কর্তব্য কি দাঁড়ায়? চুপচাপ বসে নারকুণ্ডার পোড়াঘায়ে মুলাংমুচকোর রস মাখাতে থাকা? আর, তিন তিনটি জ্যান্ত মানুষ ওদিকে সিংহের ফলারে পরিণত হতে যাচ্ছে জেনেও উদাসীন থাকা? উঁহু! এটা স্বভাব-বিরুদ্ধ টারজানের। যে দুর্জয় মানবদরদ তাকে নারকুণ্ডার সেবায় নিয়োগ করেছে, নারকুণ্ডার শত্রুপক্ষীয় ঐ মানুষগুলোকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার প্রেরণাও যোগাচ্ছে সেই দরদই।

টারজান রক্ষা না করলে মৃত্যু যে ওদের অবধারিত, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই টারজানের। এর নাম আফ্রিকার সিংহ। এক থাবায় হাতির মাথা গুঁড়িয়ে ফেলে যারা, সেই অকুতোভয় পশুরাজ! রাইফেলের একটা দুটো বুলেট খেয়ে ঘায়েল হওয়ার পাত্র ওরা নয়, বিশেষ সে রাইফেল যে ধরে আছে, তার হাত যদি গুলি চালাবার সময় কেঁপে যায় ভয়ে। আর সমুখে সিংহ দেখে ভয় পাবে না এমন শিকারী যে ঐ খাঁচায় বন্ধ লোকগুলো নয়, কী জানি কেন এ ধারণা আগে থাকতেই হয়েছে টারজানের।

ওরা ময়তে বসেছে, সুতরাং টারজানকে যেতেই হবে ওদের সাহায্যে। সে উঠে দাঁড়াল নার-কুণ্ডার ভূমিশয্যার পাশ থেকে। ও এখন আর অজ্ঞান নয়, ঐ অভাগা নারকুণ্ডা। তবে জেগেও নেই ও, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে মুলাংমুচকোর রসের ক্রিয়ায়। থাকবে কিছুক্ষণ এমনি, তা জানে টারজান। থাকুক, ততক্ষণ অন্য কর্তব্যটা সেরে আসতে পারবে সে।

টারজান যখন দৌড়োয়, হরিণকে হার মানিয়ে দেয়। ছোট বড় চাঙড় পড়ে আছে পাথরের সারা উপত্যকা জুড়ে। তাদের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে ও তীরের বেগে। পাথরের টুকরো যে পায়ে ফুটছে না, তা নয়, কিন্তু বনচর টারজানের পায়ের তলা গণ্ডারের চামড়ার মতই

দুর্ভেদ্য। সূচিমুখ পাথরকুচোও সে চামড়া ভেদ করতে অক্ষম। মাইল খানিক পথ সে মিনিট পাঁচ ছয়ের ভিতরেই অতিক্রম করল। এই পাঁচ ছয় মিনিটে গুলির আওয়াজ সে পেয়েছে মোটে আর একবার। সিংহের ডাক শুনেছে বহুবার, অবিরাম বললেই হয়। গর্জনে গর্জনে মাটি কাঁপিয়ে তুলেছে সিংহেরা। সে গর্জনের প্রতিধ্বনি অদূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে ফিরে আসছে টারজানেরই পিছনে ধাওয়া করে করে।

দূর থেকেই অবস্থাটা চোখে পড়েছে টারজানের। একটা মহাকায় সিংহ উঠে দাঁড়িয়েছে ছাদের অভগ্ন অংশটার উপরে। ফলে সেটা ধনুকের পিঠের মত বেঁকে নেমে গিয়েছে মাঝ বরাবর। আর সে অংশটা যে অনুপাতে নেমেছে, সে-ই অনুপাতেই উপরে উঠে গিয়েছে ছাদের নুয়ে পড়া অংশটা, যেটা আগে বন্ধ দরজার কাজ করছিল মানুষ তিনটার আশ্রয় পিঞ্জরে।

হ্যাঁ, নুয়ে পড়া অংশটা উঠে গিয়েছে বেশ খানিকটা, কিন্তু ঠিক ততখানি এখনও উঠেনি, যতখানি উঠলে তার তলা দিয়ে পূর্ণবয়স্ক সিংহের মত একটা পেল্লায় জানোয়ার গলে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। ঢুকে যাওয়ার মত পথ এখনও তৈরি হয়নি, কিন্তু ঢুকবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টার কসুর হচ্ছে না দ্বিতীয় আর একটা সিংহের তরফ থেকে। না, সিংহ নয়, এটা সিংহিনী, দূর থেকেই ঠাহর করেছে টারজান।

ফাঁকটা যথেষ্ট পরিমাণ প্রশস্ত হয়নি এখনো, তাই ফাঁকের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে উপর পানে ঠেলা দিচ্ছে সিংহিনী মুহুর্মুহু। এক এক ঠেলায় একটু একটু করে উঠেও যাচ্ছে আবরণটা। আর একটু হলেই কাঁধ ঢোকাতে পারে সিংহিনী।

মাথাটা ভিতরে ওর। ভিতরে যারা আছে, তাদের হাতে রয়েছে মোক্ষম হাতিয়ার, রাইফেল। গুলিও তারা করেছে দুই একবার। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি সিংহিনীর। কারণ স্পষ্ট। যারা গুলি করবে, তারা আতঙ্কে আড়ষ্ট। প্রথম গুলিটা আটকে গিয়েছিল খাঁচার দরোজাতেই, তারপরে, হকিম সাহেবের উপরেই পড়েছিল গুলি চালাবার ভার। কারণ দরোজার নিকটতম ছিলেন তিনিই—হাত তাঁর এমন কাঁপছিল যে পরের গুলি কয়েকটা ডাইনে বাঁয়ে বেমালুম খোলা দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, সিংহিনীকে স্পর্শ না করে।

ভয়? এমনই ভয় পেয়েছে অভাগারা যে, চেঁচাবার শক্তিও নেই তাদের। অবশ্য অবস্থা এখানে যা, তাতে চেঁচানোর ফলে কোন সুরাহা হবে, এমন আশাও ছিল না কিছুই। কাছে পিঠে ত শো-খানিক মড়া ছাড়া আর কেউ নেই! সাহায্য কে করবে? একটু আগে একটা প্রায়-ন্যাংটা দৈত্য দেখা দিয়েছিল বটে, তা সে ত শত্রুপক্ষেই ভিড়ে গেল! উধাও হয়ে গেল আধ-পোড়া নারকুণ্ডাকে পিঠে নিয়ে!

সে যা হোক, উপস্থিত মরণ তাদের আসন্ন! আগুনে পুড়ে মরলে যন্ত্রণা হত খুবই, তাতে সন্দেহ কী! কিন্তু সিংহ যখন টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খাবে, খাবলে খাবলে মাংস ছিঁড়ে নেবে জ্যান্ত দেহ থেকে, তখন সে-মরণও কিছু কম যন্ত্রণাদায়ক হবে না। কল্পনাশক্তি এ-তিনজনের মধ্যে বেগম-সাহেবারই বেশী থাকবার কথা। তিনি কি চোখ বুজে সেই মরণযন্ত্রণাই ভোগ করছেন এখন? মোহান পাশার দৃষ্টি ঠিক সেই রকম স্থির, যেমন নাকি হয় বিষধর সাপের চোখে চোখ পড়লে পাখির দৃষ্টি।

সিংহিনী ঘাড় ঢুকিয়ে দিয়েছে ভিতরে। আসুরিক বলে ঢুঁ মারছে উপরপানে। ধাতুর পাতখানা ভারী কিছু কম নয়, তবু একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে উপরে। সিংহিনীর পিঠের

অর্ধেকটা এখন ভিতরে! চাপা গজরানি একটা তার গলায়, চোখ দু'টো ভাঁটার মত ঘুরছে, লালা ঝরছে দু' কষ বেয়ে—

এমন সময় নুইয়ে-পড়া ছাদ থেকে এক বিকট গর্জন উঠল আকাশ-ফাটানো। এ-গর্জন সিংহের। সিংহিনী যা দেখতে পায়নি, ও তা দেখেছে। দেখেছে যে একটা মানুষ ছুটে আসছে তীর বেগে তাদেরই দিকে।

গর্জন সে করল ঠিকই। কিন্তু সে-গর্জনের ভিতর হুমকি যেমন আছে, তেমনি আছে কিয়ৎ-পরিমাণ সংশয়ও। মানুষের রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞানগম্য অবশ্য বেশী নয় এই ন্যুমা মহারাজের। কঙ্গো-সীমান্তের এ মহারণ্যে মানুষ ত কমই আসে! বেশী নয়, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এটুকু অন্ততঃ জানে ন্যুমা-স্যাবরেরা যে, চতুষ্পদ সিংহ দ্বিপদ মনুষ্যের ভয়েরই বস্তু। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ পা ত ন্যুমাদের দু'খানা বেশী। তাকে ভয় না করবে কেন মানুষ?

হ্যাঁ, ভয় করবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর ভয় যারা পায়, তারা ল্যাজ তুলে পালায় ল্যাজ থাকলে অবশ্য, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ মানুষটা পালাচ্ছে না, বরং ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে, যেন—যেন—

সিংহেরা হা-হা করে হাসে না। হাসার রীতি থাকলে এ-সিংহ হাসত। মনে মনে তার বেদম হাসিই পাচ্ছে। মানুষটা যেন যুদ্ধ করার জন্য ছুটে আসছে। যুদ্ধ—বুঝলে? যুদ্ধ—হা—হা—

না, হাসে না সিংহেরা, কিন্তু রীতি যদি থাকত হাসবার, ও হাসত নিশ্চয়।

হ্যাঁ, সাতে-পাঁচে জড়িয়ে একটা সংশয়, একটা ধোঁকা—

টারজান দাঁড়িয়েছে সমুখে ডান হাত প্রসারিত করে। [পৃষ্ঠা ৩৬০

সে-সংশয় প্রকাশ হয়ে পড়ল ওরই গর্জনের পর্দায়। দু' রকমের সুর বেজে উঠছে ওতে—

—একটা ভয় দেখানোর, একটা ভয় পাওয়ার। "দূর হও"—তড়পানির সঙ্গে "কে হে তুমি" জাতীয় একটা শিষ্টালাপের প্রয়াস।

টারজানের কান চোখা। সে দ্বিধাযুক্ত সুরের তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ সে ধরে ফেলল। একটিমাত্র শব্দ সে উচ্চারণ করল মুখে, উচ্চারণ করল ছুটতে ছুটতেই। তবে শব্দটা মনুষ্য ভাষায় নয়। যে-ভাষায় সিংহ শাসিয়েছিল "দূর হও" বলে এবং সম্ভাষণ করেছিল "কে তুমি" বলে, এ-শব্দটা সেই ভাষার। তবে মনুষ্য ভাষায় এর একটা দেবে-

নরে-ভূচরে-খেচরে সুবিদিত প্রতিশব্দও আছে, সেটি হল "টারজান"।

টারজান হেঁকেছে—"টা—র—জা—ন"—

ছাদে সিংহ নিস্তব্ধ! উপরপানে চুঁ মারতে মারতে খাঁচার দরোজায় সিংহিনা নিশ্চল। ওদিকে টারজানের গতি হয়েছে রুদ্ধ। সে এক চাঙড় পাথরের উপরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সমুখে ডান হাত প্রসারিত করে। কণ্ঠ হতে তার বেরুচ্ছে এক ওজস্বী ভাষণ। বলা বাহুল্য, সিংহ ভাষায়। মনুষ্য ভাষায় তার অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়, তা এই—"আমি টারজান। মহারাজ ন্যুমা। মহারানী স্যাবর! আমিই টারজান। আমি টারজানই। অন্য কেউ নয়। তোমরা জান, টারজান কে এবং কী। জেনেশুনেই তোমরা সকলে ভালবেসে আমাকে বনের রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছ চিরদিনের তরে। সে-হিসাবে তোমরা আমার সহযোগী ও বন্ধু। এসো, বন্ধুর মত কাছে ঘনিয়ে এসো। বনের রাজা তোমাদেরই রাজা। রাজা টারজান। তার কাছে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই এসো— চলে এসো—"

খাঁচার ভিতরে বসে তিনটি নরনারী হতবাক্, স্তম্ভিত। তাদের চোখের সমুখে ভোজবাজির খেল না কি এটা? সাক্ষাৎ দু'টো যম, সিংহ নেমে এসেছে ছাদ থেকে সিংহিনী বেরিয়ে গিয়েছে খাঁচা থেকে। দু'জনে লেজ নাড়ছে ন্যাংটো দৈত্যের কাছে দাঁড়িয়ে, আর সেই দৈত্য দুই হাত দিয়ে আদরের চাপড় মারছে মহাজন্তু দুটোর মাথায়।

(ক্রমশঃ)

অবিস্মরণীয় মণিমুক্তা

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ মাতৃভক্ত বাঘ ॥

(দুই)

লণ্ডনে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হবে। খবরটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। নামকরা শিক্ষিত ভারতবাসী মহলে দারুণ চাপা উত্তেজনা।

লর্ড কার্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি বেছে বেছে নামের তালিকা তৈরী করছেন। কয়েকজন বিখ্যাত ভারতবাসীকে তিনি লণ্ডনে পাঠাতে চান। দিন গুনছে সবাই। কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন কে জানে?

অবশেষে সেই দুর্লভ ভাগ্যবানদের নামের তালিকায় দেখা গেল বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম! এতে বাংলার বাঘকে কিন্তু কিছুমাত্র খুশী দেখা গেল না। তিনি তাঁর মায়ের কাছে গেলেন এই লণ্ডন যাওয়ার নির্দেশ পত্রখানা নিয়ে। সর্বপ্রথমেই।

সব শুনে জগত্তারিণী দেবী কোন কথা বললেন না। শুধু ছেলের মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

বাংলার বাঘ মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসবে লণ্ডনে যাওয়ায় মায়ের মত নেই। মায়ের যেখানে অমত, সেখানে নেই কোন প্রশ্ন, নেই কোন তর্ক। মায়ের মত নেই অর্থাৎ মায়ের আশীর্বাদও নেই। এই সোজা যুক্তি বাংলার বাঘ আশুতোষের।

মায়ের আশীর্বাদ ভিন্ন লণ্ডনে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই সোজা কথায় মাতৃভক্ত বাঘ বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন: আমার মায়ের অমত, তাই আমি যেতে পারবো না।

: সামান্য একটা ভারতবাসীর এত বড় সাহস!

মুচকি হাসলেন বড়লাট।

লিখলেন: তোমার মাকে জানাও, এটা বড়লাটের হুকুম। মানতেই হবে।

চিঠি পড়ে গর্জন করে উঠলেন মাতৃভক্ত বাঘ। তিনিও লিখলেন: আমার কাছে মায়ের আদেশের চেয়ে কারোও আদেশ বড় নয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

(১০)

ভূপাল তরক্ষুর ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে নাব্‌জানবির বুকের উপর দিয়ে। নাওবাং বা নব বাংলার অধিবাসীরা তাদের পিতৃভূমি গৌড়-মগধের পবিত্র নদী জাহ্নবীর নামই আরোপ করেছে এই নতুন দেশের এক বেগবতী নদীর উপরে। নব জাহ্নবী হয়েছে নাব্‌জানবি। যেমন মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণর নাম তারা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, নতুন দেশের রাজধানীকে কোনারসুবার্ণ নামে অভিহিত করে। নতুন মাটি, নতুন জল, হাওয়াও নতুন। তবু তাদেরই ভিতরে পুরোনোকে দেখবার এ প্রয়াস যেমন স্বাভাবিক, করুণও তেমনি।

হ্যাঁ, ভূপাল তরক্ষু হলেন নির্বাসিত, বহুদূরের নিভৃত এক উপত্যকায় স্থাপন করলেন নতুন বাসভূমি। কালক্রমে ধর্মান্তর গ্রহণেও বাধ্য হলেন ঘটনাচক্রে। তাঁর জীবন কেটে গেল মনস্তাপে আর আক্রোশে, তাঁর উত্তরপুরুষেরা জীবন শুরু করল অনুতাপের মধ্য দিয়ে, ভূপাল তরক্ষুর অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করবার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। দুই দুটো শতাব্দী কেটে গিয়েছে এইভাবে, নাওবাংয়ের প্রতি নাগোড়ার প্রাণের টান একটুও ক্ষীণ হতে পারেনি এতদিনে। ক্রমাগত নাগোড়া থেকে কোনারসুবার্ণে দৌত্য গিয়েছে—"হলামই বা আমরা এখন অন্য ধর্মের লোক, দেহে আমাদের এখনও বাঙ্গালীর রক্তই বইছে, গৌড়-মগধের জীবনধারাই এখনও আমাদের সমাজ সংসারকে রেখেছে সচল আর প্রাণবন্ত করে। কেন আমাদের এখনো দূরে ঠেলে রাখছ তোমরা?"

এ আবেদনে নাওবাংও যে সাড়া দেয়নি তা নয়, পালটা দৌত্য মাঝে মাঝে আসে নাগোড়ায়। সংস্কৃতির বাঁধন শিথিল হয়ে আসছে যেখানে,

সেখানে নতুন গ্রন্থি দেয় টান-টান করে, অনেক বুলি কপচায়, "নাওবাং-নাগোড়া ভাই ভাই", "মৈত্রী বন্ধন অটুট রহে"—ইত্যাদি। নাগোড়া যা চায়, তা কিন্তু হয় না। নাগোড়াকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না নাওবাং।

পারে না তা করতে। বিশ্বাসে চিড় খেয়েছে, সে-চিড় জোড়া লাগবে কিসে? ভূপালের দেশ-দ্রোহের কথা অবশ্যই ভুলতে পারত নাওবাং, যদি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে আশ্রয় না নিত তাঁর অনুগামীরা। গলদ হয়ে গিয়েছে ঐখানে।

এ জিনিসটা নাগোড়ার অন্য কেউ ততখানি স্পষ্ট বুঝতে পারেনি, যতখানি পেরেছিল তরুণ মোবারক—ভূপাল তরফ্ফুর অধস্তন সপ্তম পুরুষে নাগোড়ার প্রধান পঞ্চায়েত। সেই ভূপালের আমল থেকেই নাগোড়ার শাসনভার ন্যস্ত রয়েছে একটা পঞ্চায়েতের হাতে। তার চারজন সদস্য হন নির্বাচিত, পঞ্চম আসনটি বংশানুক্রমে অধিকার করে থাকেন তরফ্ফুর বংশের উত্তরাধিকারী। অধিকার করেছিল এই মোবারকও।

অধিকার করবার পরে সে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছিল নাওবাংয়ে। "নাওবাংয়ের সঙ্গে নাগোড়াকে গেঁথে নিন. এই আমরা চাই। অপরাধ করেছিলাম, সাজাও পেয়েছি তার। শোধবোধ! আমাদের জন্ম-অধিকার নাওবাংয়ের নাগরিকত্ব, তা থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকব আমরা, এ কোন যুক্তির কথা নয়।"

পারেনি মোবারক। গুরু মহানন্দ ভারতীকে টলাতে পারেনি এক তিলও। তিনি ত দর্শন দেনই নি নাগোড়ার মুখপাত্রকে, মন্ত্রী কশ্যপকে দিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বলে পাঠিয়েছিলেন—"নাগোড়ার দিক থেকে অনুরূপ প্রয়াস এর পর থেকে বন্ধ থাকলেই ভাল হয়। যা হবার নয় তা নিয়ে সময় এবং উদ্যম কেন খরচ করা?"

মর্মাহত হয়েছিল মোবারক। স্থান কাল ভুলে গিয়েছিল সেই বেদনায়। কথা হচ্ছিল সভা-মণ্ডপে বসে। রক্ত প্রস্তরের ষাটটা স্তম্ভের মাথায় হাজার বছরের পুরানো শ্বেতপাথরের ছাদ এখনো অটুট, বজ্রের মত শক্ত। মণ্ডপের চার দিকের দেয়ালের গায়ে গায়ে উঁচু বেদীর উপরে নাওবাংয়ের তেরো শো বছরের রাজাদের সুবৃহৎ পিতলমূর্তি। শঙ্করাদিত্য থেকে শুরু করে বর্তমান মহারাজার বাবা মহেন্দ্রাদিত্য পর্যন্ত। সবসুদ্ধ বিয়াল্লিশটি মূর্তি। দক্ষ ধাতুশিল্পীর করস্পর্শে রাজমূর্তিগুলি গড়ে উঠেছে অপরূপ সৌষ্ঠবে। দৃপ্ত, মহিমামণ্ডিত, প্রাণবন্ত।

এ বংশের আদি পুরুষ শঙ্করাদিত্যের মূর্তিটি আবার অনেকখানি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে অন্য সব মূর্তির তুলনায়। একে উচ্চতায় অন্ততঃ দেড় ফুট বেশী, তায় মাথায় পুরো মুকুট একখানা থাকলেও, এর ডান হাতে রয়েছে অতিরিক্ত একটা অর্ধমুকুট। এর ইঙ্গিত স্বভাবতঃই সেই ঐতিহাসিক অর্ধমুকুটের দিকে, যা বঙ্গ-মগধেশ্বর মানবাদিত্য বিদায়কালে সঁপে দিয়েছিলেন অনুজের হাতে।

হ্যাঁ, বিয়াল্লিশটা রাজমূর্তির মধ্যে শঙ্করাদিত্যের মূর্তিই দর্শকের দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকর্ষণ করে, তাতে কোন ভুল নেই। মণ্ডপে প্রবেশের পর থেকেই মোবারকেরও দৃষ্টি বার বার নিবদ্ধ হয়েছে ঐ মূর্তির দিকে। এখন মন্ত্রীর মুখ থেকে কঠোর প্রত্যাখ্যানের বাণীটা নিঃসৃত হওয়া মাত্র ব্যথাহত মোবারক একটা চিৎকার করে ছুটে চলে গেল সেই শঙ্করাদিত্যর মূর্তির কাছে—"আদি রাজা! বিচার কর তুমি, বিচার কর। এই যে আফ্রিকার আদি-অন্তহীন বনে নতুন বাংলা গড়ে উঠেছিল তেরশো বছর আগে, সেই গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদেরও পূর্বপুরুষেরা কি কিছুই করেনি, যারা আজ নাগোড়ায় নির্বাসিত, প্রত্যাখ্যাত, লাঞ্ছিত?

তোমারই মন্ত্রী ছিলেন তরক্ষু, আমার বংশের আদি পুরুষ। সেই তরক্ষুর কাছে নওবাং যে কতরকমে কতখানি ঋণী ছিল!"

আর বেশী বলবার সুযোগ সেদিন পায়নি মোবারক। তরক্ষুর স্থলাভিষিক্ত, চল্লিশ পুরুষ পরের মন্ত্রী কশ্যপ গিয়ে ধরে ফেললেন তাকে, একরকম গায়ের জোরেই টানতে টানতে তাকে নিয়ে এলেন একেবারে সভাগৃহের দ্বারে—"আপনি অতিথি, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না মিঞা, কিন্তু—"

"অতিথি? না, এই আমার ঘর। আমার দেহের রক্ত যদি খাঁটি বাঙ্গালীর রক্ত হয়, তবে ঠিক জানবেন, আমারই ঘরের দোর আমার সমুখে আপনি চিরদিন বন্ধ রাখতে পারবেন না। যে বিচার আপনারা করলেন না, সে বিচার হয়ত আমরা পাব আগামী দিনের রাজার কাছ থেকে, তেরোশো বছরের অন্তে সাগর পার থেকে যাঁর আসবার কথা আছে।"

মোবারক তারপর চলে এসেছিল নাগোড়ায়, কিন্তু স্থির হয়ে থাকতে পারেনি। তেরোশো বছর যে হয়ে এল, সে হিসাব তার আছে। এদিকে নওবাংয়ের অপুত্রক বৃদ্ধ রাজা কনকাদিত্যের ত অন্তিম অবস্থাই চলছে! যে কোন দিন তাঁর প্রাণবায়ু শুট করে বেরিয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণ ভারতীর বাণী যদি মিথ্যা না হয়—

মিথ্যা কখনোই নয়। সে বাণীর সমর্থন অতি অল্পদিন আগে এইখান থেকেই পাওয়া গিয়েছে আবার, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই। হঠাৎ এক ফকির এদেশে এসেছিলেন, নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে। নানা ভাবেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে দৈবী শক্তির অধিকারী পুরুষ তিনি। সেই তিনিই নাগোড়াবাসীদের চিরন্তন অভিযোগের কথা শুনে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাদের অভীষ্ট

—"তুই এখানে কী করছিস বেটা!"

সিদ্ধ হবে অতি সত্বরই। সুদূর বাংলা মুলুক থেকে অচিরেই আগমন হবে নাওবাংয়ের নতুন রাজার, তিনিই সুবিচার করবেন নাগোড়াবাসীদের উপরে।

হাঁতের আঁকাবাঁকা ডাণ্ডাখানা মোবারকের কাঁধে ছুঁইয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন—"তুই এখানে কী করছিস বেটা! যা, যা, বেরিয়ে পড়, আগু বাড়িয়ে আন গিয়ে রাজাকে। তোকে না হলে ত চলবে না তার!".

মোবারকের শিরায় শিরায় রক্ত চনমন করে উঠেছিল একথা শুনে—"কেমন করে তাঁকে চিনব? কোন্ পথে গেলে দেখা পাব তাঁর?"

ফকির শুধু বলেছিলেন—"খোদা দেবেন চিনিয়ে। খোদা দেখিয়ে দেবেন পথ।"

মোবারকের আর দেরি সইল না। ফকিরের দোয়া নিয়ে তক্ষুণি সে বেরিয়ে পড়ল। আদ্দিস আবাবাই নিকটতম সভ্য নগরী। আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের বাসনা নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে যে-কেউ আসুক, এই শহরে এসেই তাকে খুঁজতে হবে প্রবেশের পথ।

দীর্ঘ তিন বৎসর আদ্দিস-আবাবায় কাটল মোবারকের। যে ছিল অরণ্যঘেরা নাগোড়ার অর্ধসভ্য অজ্ঞ আদিবাসী, সে ক্রমে হয়ে উঠল মার্জিত রুচি সবজান্তা আধুনিক যুবক, যে রাইফেল চালিয়ে সিংহ শিকার করতে ভয় পায় না, যে দরকার হলে এরোপ্লেন চালাতে পারে আকাশ-পথে। নানা বৃত্তি ধরল এবং ছাড়ল মোবারক। শেষ পর্যন্ত চাকরি নিল অ্যালায়ান্স হোটেলে, যোগাযোগ রাখতে লাগল সবগুলি হোটেলের সঙ্গে। তার রাজা যখন আসবেন, এই হোটেল-গুলিরই কোন-না-কোনটিতে তাঁকে উঠতে হবেই ত! চোখ কান খোলা রাখলে মোবারক কেনই বা পাবে না তাঁর সন্ধান?

ফকির ওদিকে নাগোড়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, চলে গিয়েছেন বৃহৎ বিশ্বের অন্য কোন দেশের ব্যথিত জনগণকে সান্ত্বনা আর আশ্বাসের বাণী শোনাতে। "কবে আসবেন আমাদের রাজা বলে যান দয়া করে"—শেষ মুহূর্তে তাঁকে চেপে ধরেছিল নাগোড়াবাসীরা। তাতে তিনি পাহাড়ের মাথার দিকে আঙুল তুলেছিলেন—"ঐখানে গুহা আছে একটা, জানো ত?"

"জানি বইকি—"

"সেই গুহা থেকে যেদিন বজ্রধ্বনির মত আওয়াজ শুনবে তিনবার, সেইদিন জানবে এসেছেন তোমাদের রাজা"—

চলে গেলেন ফকির।

সে আজ দুই বৎসরেরও বেশী হল। সকাল সন্ধ্যা পর্বতচূড়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে নাগোড়ার মানুষ, কান পেতে থাকে বজ্রধ্বনির মত ধ্বনি সেখান থেকে ওঠে কি না, রাজার আগমনবার্তা ঘোষণা করে।

দীর্ঘদিন গিয়েছে বিফল প্রতীক্ষায়। তবু আশা দিনের দিন বলবতা হয়েছে নাগোড়াবাসীর অন্তরে। আর কতদিন হতে পারে দেরি? তেরোশো বছর অতিক্রান্ত। রাজা কনকাদিত্যের দেহান্ত ঘটেছে শত শতে। সিংহাসন শূন্য। তার উপরে আদি রাজা শঙ্করাদিত্যের সেই ঐতিহাসিক অর্ধমুকুট স্থাপন করে তারই নামে রাজ্য শাসন করে যাচ্ছেন মহামন্ত্রী কশ্যপ, ত্রেতায় যেমন দাশরথি ভরত অযোধ্যা শাসন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে।

এ-অবস্থা ত বেশীদিন চলতে পারে না! রাজা এলেন বলে। আর সেই সত্যদর্শী ফকির ত অসত্য বলবেন না কখনো, সে-রাজার শুভ আশীর্বাদ প্রথম লাভ করবে নাওবাংয়ের ক্রোড়চ্যুত নাগোড়া-বাসীরাই। তাই কান পেতে থাকে তারা সকালে সন্ধ্যায়, ওঠে কিনা বজ্রধ্বনি পর্বতচূড়ার গুহা থেকে।

অবশেষে সে শুভ মুহূর্ত এল এক ধূসর সন্ধ্যায়। উৎকর্ণ হয়ে উঠল হাজার অধিবাসী নাগোড়ার। পর্বতচূড়া উঠেছে গর্জে। বজ্রের ভাষায় হুঙ্কার করল—বার বার তিনবার। তারা ত জানে না যে তাদেরই অতি প্রিয় তারিখ মোবারক প্রবাস থেকে ফিরে গুলি চালিয়েছে সাপ মারবার জন্য! গুহার বদ্ধ হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অবশেষে যখন মুক্ত আকাশে বেরুল তার আওয়াজ, তখন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে প্রলম্বিত হতে হতে একটানা অশনি গর্জনের মতই তা কানে পৌঁছোল উপত্যকার মানুষদের।

এইবার শুরু হল জয়ধ্বনি! উল্লাসের নির্ঝর

পাষাণবাঁধের নীচে ফুঁসছিল এতদিন, আজ তার সমুখের বাধা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেসে গেল প্লাবনের মুখে। "আদিত্য মহারাজ কু-উ-ম"—উঠল হাজার কণ্ঠে জিগীর। মশাল জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে নাগোড়ারা হাজার মানুষ চারখানা গাঁ থেকে একসাথে ধেয়ে এল পাহাড় বেয়ে উঠে গুহামধ্যে আদিত্য মহারাজের দর্শন পাওয়ার জন্য। সেই রাজা যাঁরা সুবিচারে দু'শো বছরের অপূর্ণ অভীষ্ট পূর্ণ হবে নাগোড়াবাসীর। "কু-উ-ম"—অন্তরের অন্তস্তল থেকে অভিবাদন বেরুচ্ছে ভক্ত প্রজার, অচেনা মানুষ এই নতুন রাজার উদ্দেশে।

এদিকে—

শতানীকের কী হল?

এক মাসেরও বেশী শয্যাগত থাকবার পরে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন শতানীক সেন। দেহ এখন আগের মতই সুস্থ, তবে আগের সে পালোয়ানসুলভ শক্তি ফেরত পেতে অবশ্যই দেরি আছে। ডাক্তারেরা বলে দিয়েছেন—"হোটেলে গিয়ে এখন চারবেলা পেট ভরে খান। আট ঘণ্টা অন্ততঃ ঘুমোন রাত্রে, আর খাওয়া এবং ঘুমের সময়টা বাদ দিয়ে হোটেলের ছাদে খোলা হাওয়ায় বসে থাকুন বা পায়চারি করুন গিয়ে। পড়াশুনা চলবে না, চলবে না কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। মস্তিষ্ক এখনও কাহিল, তার উপরে বোঝা চাপাবেন না কোনমতে। কত-বড় ফাঁড়া যে আপনার কেটে গেল ইদানীং, তা আমরাই জানি, এই ডাক্তার কয়জন। আপনি তা ধারণাই করতে পারবেন না। আর যদি দশ মিনিট দেরি হত অক্সিজেন পড়তে—"

দেরি যে হয়নি, সেজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় একজন মাত্র লোককে। সে-লোক হচ্ছেন ইতালীয় ডাক্তার সিল্‌ভিও এনরিকো। যৌবনের পারে পৌঁছেও যিনি যুবাসুলভ ছুটোপাটি করেন সব

— "ঐ কর্মটি করবেন না।"

ব্যাপারে। বলতে গেলে তাঁর ঐ যে ব্যস্তবাগিশপনা সব ব্যাপারে, ওরই দৌলতে আজ শতানীক সেন এবং রাহুল চৌধুরী বৈতরণীর এপারে চরে বেড়াতে পারছে।

খুব সচেতন শতানীক এ সম্বন্ধে। রীতিমত কৃতজ্ঞ এনরিকোর কাছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে যখন হোটেলে এল, র‍্যাফেলিনোকে অনুরোধ করল—"মশাই, আপনার সেই ডাক্তার বন্ধুকে ডাকুন একবারটি—"

"কেন? ধন্যবাদ দিতে চান?"—পষ্টো জবাব দিল র‍্যাফেলিনো—"ঐ কর্মটি করবেন না। ধন্যবাদ দিলে রেগে যায় ও, বিদকুটে স্বভাব ওর

মশাই। বলে—কর্তব্যই করেছি, তার বেশী কিছু করিনি, ধন্যবাদ আবার কী ?"

"না, না, ধন্যবাদ ছাড়াও অন্য দরকার আছে। এখন ত আর হাসপাতালের ডাক্তারদের পাচ্ছি না। দেহটা সত্যিই সেরে উঠেছে কিনা, কার কাছে জানতে পাব ? উনি এসে দেখে যান যদি, ভরসা দেন যদি, মনে বল পাই তাহলে—"

র‍্যাফেলিনোকে অগত্যা ফোন ধরতে হল। এনরিকো বললেন—"মিস্টার সেন যদি নতুন কিছু ফ্যাসাদে পড়েন, অসুখের বা আততায়ীর আক্রমণে, খবর পেলেই আমি ছুটে যাব। উপস্থিত আমার হাতে এক মিনিট সময় নেই বাজে কাজে নষ্ট করবার মতন। রোগী ? না, রোগীর সংখ্যা হঠাৎ ফেঁপে উঠেনি আমার হাতে। যথাপূর্বং দিন আনছি, দিন খাচ্ছি। এক যোগীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে হে ! তাঁর কাছ থেকে কিছু পরলোকের পাথেয় হাতড়ে নেবার ফিকিরে আছি। এই মুহূর্তেই তিনি—ওহে, ওহে সেনর র‍্যাফেলিনো—মিস্টার সেনকে লাইনটা দাও ত ! সেই যোগী কথা কইতে চান সেনের সঙ্গে—"

যোগী ? কোন্ দেশের লোক ? র‍্যাফেলিনোর মুখ থেকে বৃত্তান্তটা শুনবার পরে স্বভাবতঃই শতানীক অতিমাত্র কৌতূহলী হয়ে উঠল যোগীর সম্বন্ধে। আজকাল অবশ্য ইউরোপে আমেরিকায় যোগের চর্চা খুবই ব্যাপক। তাহলেও কেমন যে সংস্কার, যোগ বা যোগীর কথা শুনলেই অনিবার্য-ভাবে মনে পড়ে ভারতের কথা। এ-যোগী যদি ভারতীয়ই হন—

নাঃ, আর কী এমন লাভ তাতে ! একটা দেশী লোকের সঙ্গে আলাপ করা যায় দু' দণ্ড, এই যা। শতানীক মনের আগ্রহ মুখে প্রকাশ পেতে দিল না, হাত বাড়িয়ে লাইনটা ধরল—

ওদিক থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠ কথা কয়ে উঠল অবিমিশ্র বাংলা ভাষায়—"আপনার পদবি সেন ! মনে হইতেছে আপনি গৌড়ীয় সেন হইতে পারেন। গৌড়বঙ্গের বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন রাজাদের ইতিহাস নাওবাংয়ের দূর প্রবাসে বসিয়াও আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবসময়েই জ্ঞাত ছিলেন—"

শতানীক চমৎকৃত, স্তম্ভিত ! বিশুদ্ধ বাংলাই ইনি বলছেন বটে, কিন্তু কেতাবি বাংলা, তাও বিজ্ঞানসম্মত বাংলা। আজকাল ত এ-ধরনের বাংলা ভাষা বই লেখার সময়েও কেউ ব্যবহার করে না ! কথা বলার সময় ত নয়ই ! তবে ?

দ্বিতীয়তঃ, সেন-পদবি শুনেই ইনি এক লাফে চলে গিয়েছেন বাংলার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে, যখন সিংহাসনে আসীন ছিলেন কর্ণাট থেকে সমাগত সামন্ত সেনের বংশধরেরা ! এঁর পূর্বপুরুষেরা তখন থেকেই প্রবাসী। কোথায় প্রবাসী ? কেন প্রবাসী ? নাওবাং ? কোথায় নাওবাং ?

কিন্তু চিন্তার অবকাশ নেই, যোগী কথা কইছেন লাইনের ও-প্রান্তে—"আপনি ঠিক সুস্থ নহেন শুনিতেছি। অতএব আপনাকে এখানে আগমন করিতে অনুরোধ করিব না। আমিই অদ্য সন্ধ্যা-বেলাতেই ডক্টর এনরিকো সমভিব্যাহারে আপনার বাসস্থানে যাইব—"

"খুব আনন্দ পাব, খু-উ ব"—উচ্ছ্বসিতস্বরে উত্তর দিল শতানীক—"কিন্তু কৌতূহল মার্জনা করবেন, এ-খবরটি এক্ষুণি জানতে না পারলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই চার ঘণ্টা সময় কণ্টকশয্যার মত অস্বস্তি-কর হবে আমার পক্ষে। আমি গৌড়ীয় সেন, ঠিক ধরেছেন আপনি, যদিও সেন রাজাদের বংশীয় নিশ্চয়ই না। কিন্তু আপনি কে ? এবং কী ? দয়া করে একটু আভাস দেন যদি, যদিও জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই আমার ধৃষ্টতা—"

"কোন রূপেই ধৃষ্টতা নহে"—বললেন যোগী—"বিশদ বিবরণ সাক্ষাতেই কহিব। আপাততঃ ইহাই শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হউন যে, ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্বে গৌড়-বঙ্গের একদল অভিযাত্রী এই মহাদেশে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। সে উপনিবেশের অস্তিত্ব এখনও রহিয়াছে। আমি তত্রত্য রাজগুরু শ্রীমৎ মহানন্দ ভারতীর এক অধম শিষ্য। পাশ্চাত্য জগৎ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে কর্ণসুবর্ণ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমৎগুরু মহারাজের নিকট হইতে এক যৌগিকবার্তা প্রাপ্ত হইলাম এই মর্মে যে—"

"যৌগিক বার্তা? টেলিপ্যাথি না কি?" মাঝপথে এই আধা-প্রশ্ন, আধা-মন্তব্যটি না করে পারল না শতানীক।

কিন্তু কথাটা ওদিকে যোগীর কর্ণগোচর হয়েছে বলে মনে হয় না ত। তিনি বলে যাচ্ছেন—"গুরু বলিতেছেন, শশাঙ্ক মহারাজের অর্ধমুকুট আমাদের দেশে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। ঐ মহামূল্য সম্পদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, শ্বেতদ্বীপ-যাত্রার পূর্বে তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার শিষ্যাধম এই অচ্যুতানন্দকেই। যাহা হউক, এ-বিষয়ে আরও যদি আপনার কিছু কৌতূহল থাকে, সাক্ষাতে তাহার নিবৃত্তি করিব।"

শতনীকের মুখ থেকে যোগীর কথা সবই শুনল র‍্যাফেলিনো। সবই, কেবল মুকুটের কথাটুকু ছাড়া। শুনবার পরে র‍্যাফেলিনো বিকৃত করল মুখটা—"চিরদিন এনরিকোর একটা দুর্বলতা আছে যোগীদের সম্পর্কে। ঐ জন্যেই ভাক্তারিতে ওর পশার হল না তেমন।" (ক্রমশঃ)

বৃহত্তম গ্রহ—

সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ হ'ল জুপিটার বা বৃহস্পতি। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৪৮ কোটি.৩০ লক্ষ মাইল। তবু নৈশ আকাশের কম জ্যোতিষ্কই বৃহস্পতির মত অতখানি উজ্জ্বলতার গর্ব করতে পারে। এর ব্যাস ৮৮৭৭০ মাইল। অন্য সবগুলি গ্রহের পদার্থসম্ভার যোগ দিলে যা হয়, একা বৃহস্পতির পদার্থসম্ভার তার দ্বিগুণ, এর বাষ্পমণ্ডল কয়েক শত মাইল গভীর।

এই বাষ্পমণ্ডলে অ্যামোনিয়া, মিথেন, হেলিয়াম আর উদযান বাষ্পেরই সমধিক প্রাচুর্য। অথচ পৃথিবী এবং তারই মত ক্ষুদ্র অন্য অন্য গ্রহে হেলিয়াম ও উদযানের পরিমাণ খুবই কম। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একশ্রেণীর অভিমত এই যে এই পার্থক্যের জন্যই পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে, অন্যত্র হয় নি।

বৃহস্পতির চাঁদ অর্থাৎ উপগ্রহ যে কতগুলি, তা সঠিক বলা যায় না। যতদূর জানা গিয়াছে, অন্ততঃ বারোটা চাঁদ নিয়মিত ভাবেই আবর্তিত হচ্ছে গ্রহটিকে ঘিরে। আরও দুই চারিটা থাকার পক্ষে বাধা কিছুই নেই। ঐ বারোটার মধ্যে অন্ততঃ চারটার আয়তন আবার সৌরমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম গ্রহ মঙ্গল ও বুধের সমানই।

হাঁদা-ভোঁদার

গোল্লা পর্ব

একি! এযে সাবান জলে ভর্তি!
মরেচে!
কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা এইমাত্র-ইয়ে-মানে সমস্ত পরিস্কার করছিলাম!
ঠিক আছে, আমি পুঁছে নিয়েছি। কিন্তু দেশলাইটা কোথায় রাখলুম।
এই যে স্যার, গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছি।
বাপরে! আমার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিস হতচ্ছাড়া!
অসাবধানী বেল্লিক! তোদের জন্যে দোকান ঘরে আগুন লেগে যেতে পারতো!
মরেচে, এযে পিসেমশাই রে!
ঠিক আছে, এবার আমি নিজেই ধরিয়ে নিতে পারবো।
গ্রুগহ্! তামাকের গন্ধটা বড় অদ্ভুত তো!
পিসেমশাই নির্ঘাত শালপাতা ফুঁকছে!
ভোঁদারে, পিসেমশাই ধাতস্থ হবার আগেই চল আমরা কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দি!

দিনকর শর্মা

নেই! লাইট-হাউস-রক্ষী মানুষটার পাত্তাই নেই কিছু!

পানামা থেকে বেশী দূর নয় অ্যাসপিনওয়াল। সেখানকার লাইট-হাউসের কথাই হচ্ছে। রাত্রে ঝড় হয়েছিল, রক্ষী হয়ত কোন কারণে দ্বীপের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল দুই এক মিনিটের জন্য। সেই সময়েই হয়ত ঐরাবত ঢেউ একটা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে মানুষটাকে। এ ছাড়া ত আর অন্য কিছু অনুমান মাথায় আসছে না কারও।

বিপদের কথা খুবই। নিউইয়র্ক থেকে পানামা ত হরদমই জাহাজ আর স্টীমারের আনাগোনা চলছে। মাঝপথে ঐ মশক সাগরটি (মস্কিটো বে) একটি মৃত্যুফাঁদ বললেই হয়! কত যে চড়া আর চোরা পাহাড় ঐ জলভাগটাতে! দিনের বেলাতেই তাদের ভিতর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে যাওয়া শক্ত কাজ, রাত্রে ত তা অসম্ভবই হত, ঐ অ্যাসপিনওয়াল লাইট-হাউসের মাথায় আলোটি না জ্বললে। রাতের যাত্রী জলযানগুলির একমাত্র পথের দিশারী ঐ আলোক-স্তম্ভটি।

তারই রক্ষী আজ সহসা বেপাত্তা। এই বারো ঘণ্টার দিনের আলো নিভবার আগেই তার জায়গায় নতুন লোক একজন পাঠানো চাই। না পাঠাতে পারলে কত জাহাজের যে কত রকম বিপদ ঘটে যাবে, ভাবতে গিয়েই ঘেমে উঠছেন আইজাক ফকনব্রিজ। অ্যাসপিনওয়ালে উনিই মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কনসাল, আলোক-স্তম্ভের খবরদারির ভার তাঁরই উপরে।

বারো ঘণ্টার মধ্যে লোক পাঠানো চাই। তা আবার যাকে তাকে ধরে পাঠানো চলবে না। লোকটার কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া দরকার। কিন্তু নিষ্ঠার প্রশ্ন ত পরে উঠবে, আপাততঃ সবচেয়ে মুশকিল

দাঁড়িয়েছে এই যে, কাজটার জন্য প্রার্থীই নেই কেউ।

প্রার্থী না থাকার সঙ্গত কারণ আছে বই কি! লাইট-হাউসের রক্ষী হয়ে যে যাবে, জীবনটি হবে তার দুর্বহ। এ অঞ্চলের সব লোকই অল্পবিস্তর কুঁড়ে আর ভবঘুরে জাতীয়। অথচ ঐ যে লাইট-হাউস-রক্ষী, সে ত বলতে গেলে একটি কারাবন্দী ছাড়া আর কিছু নয়। রবিবারে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছাড়া সে তার ঐ পাহাড়-দ্বীপটি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না। দিনে একবার একখানি নৌকা তার কাছে আসে অ্যাসপিনওয়াল থেকে, তাতে থাকে একদিনের খাবার আর পানীয় জল মাল নামিয়ে দিয়ে নৌকা তক্ষুণি ফিরে যায়।

দ্বীপটির আয়তন সাকুল্যে এক একর, বাসিন্দা সেখানে একটিও নেই। রক্ষীকে থাকতে হয় ঐ আলোক-স্তম্ভের ভিতরেই। দিনের বেলায় তার কাজ হল ব্যারোমিটারে আবহ পরিবর্তনের পূর্বাভাস পেলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রংয়ের পতাকা স্তম্ভের মাথায় উড়িয়ে দেওয়া, চলমান জাহাজেরা পতাকার রং দেখে বুঝে নেয় কী ধরনের আবহাওয়া তারা অতঃপর প্রত্যাশা করতে পারে।

সন্ধ্যায় ত তার একমাত্র কাজ স্তম্ভের মাথায় আলোটি জ্বেলে দেওয়া।

কঠিন কাজ এর কোনটাই হত না, যদি না স্তম্ভ-চূড়ায় পৌঁছোবার জন্য চারশোর উপরে সিঁড়ি ভাঙতে হত কী বার। আর কী খাড়া উঁচু সেই সিঁড়ির ধাপগুলি। দিনে কতবার যে উঠতে হবে সেই সিঁড়ি বেয়ে, তারও কিছু ঠিক ঠিকানা নেই, আবহাওয়ার পরিবর্তন কত ঘন ঘন হবে, তারই উপরে তা নির্ভর করছে।

না, এ কাজের জন্য যোগ্য লোক পাওয়া সব সময়েই শক্ত। অনেক দিন খোঁজাখুঁজির পর তবে যদি একজন মেলে। অথচ আজ, আজ ত ফকনব্রিজের হাতে সময় মাত্র বারো ঘণ্টা! এর মধ্যে কি আর সেই দুর্লভ বস্তু তিনি পায়বেন জোটাতে? গোড়া থেকে হতাশ হয়েই বসে আছেন ভদ্রলোক।

কিন্তু কী তাঁর বরাত জোর! দুপুর নাগাদ রবাহূত একটি প্রার্থী এসে হাজির। লোকটি বুড়ো তাতে ভুল নেই, বয়স ষোল হয় সোত্তরই হবে। তবু তাগড়া চেহারাতে চলাফেরার ভঙ্গি এখনো সতেজ। লোকটা যে দীর্ঘদিন সৈনিকের কাজ করেছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

"কোথাকার লোক তুমি?"—জিজ্ঞাসা করলেন ফকনব্রিজ।

"পোলাণ্ডের—"

"এত দিন কোথায় কাজ করেছ?"

"এখানে ওখানে! বহু জায়গায়ই ঘুরেছি—"

"ভবঘুরে লোক দিয়ে ত এ কাজ হবে না! এমন একটি রক্ষী আমার দরকার, যে লাইট-হাউসে টিকে থাকবে সারা জীবন।"

"আমি থাকব। সারা জীবন ঘুরেছি, এইবার চাই বিশ্রাম।"

"যুদ্ধ করেছ কোথাও? সরকারী চাকরির সার্টিফিকেট আছে কিছু?"

জামার পকেট থেকে এক ফালি জীর্ণ রেশমী কাপড়-দিয়ে-বাঁধা ছোট্ট পুলিন্দা একটা টেনে বার করল বুড়ো। কাপড়টা যেন কোন পতাকার টুকরো বলে মনে হল ফকনব্রিজের। বুড়ো ততক্ষণে পুলিন্দা খুলে ফেলেছে—"যা কিছু আছে, তা এই। এই ক্রশটা পেয়েছিলাম ১৮৩০-এ। এই দ্বিতীয় ক্রশটা দিয়েছিল স্পেন সরকার, কার্লিস্ট যুদ্ধের সময়। তৃতীয়টা ফরাসী বাহিনীর, চতুর্থটা হাঙ্গেরির। তারপর এই যুক্তরাষ্ট্রেই লড়েছিলাম গৃহযুদ্ধের সময়। এখানে ক্রশ দেওয়ার রেওয়াজ নেই। দিয়েছে এই কাগজখানা।"

কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়ে ফকনব্রিজ বললেন—"স্ক্যাভিনস্কি নাম তোমার? বেয়নেট যুদ্ধে একাই দুটো পতাকা কেড়ে নিয়েছিলে শত্রুর? বাহাদুর যোদ্ধা ছিলে ত!"

"আলোক-স্তম্ভের রক্ষী হিসাবেও বাহাদুরি না হোক, কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেব।"

"তা বিশ্বাস করি কিন্তু কথা এই, দিনে যে কতবার স্তম্ভের চূড়ায় উঠতে হবে, তার ঠিক নেই। পায়ে বেশ জোর আছে ত?"

"কালিফোর্নিয়া থেকে পানামা ত হেঁটেই এলাম!"

"নৌ-বিভাগের কাজ?"

"তিমি-ধরা জাহাজে ছিলাম তিন বছর—"

"অনেক রকম কাজই ত করেছ দেখছি!"

"যা কোনদিন করিনি, তা হল বিশ্রাম।"

"কেন? কেন?"

মাথা নেড়ে বুড়ো বুঝি একটু খেদের সঙ্গেই উত্তর দিল—"ভাগ্যই ঐরকম আমার।"

ফকনব্রিজ ভাবলেন একটু—"সবই ত ভাল। তবু, কী জান, লাইট-হাউস-রক্ষীর কাজ এটা। ওর পক্ষে তোমার বয়স একটু বেশী হয়েছে।"

বুড়ো হঠাৎই যেন বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়ল—"দিন কনসাল, কাজটা আমায় দিন। ঘুরে ঘুরে আমি শ্রান্ত, এবার আর বিশ্রাম না হলে চলে না আমার। এইরকম কাজই কিছু চাইছিলাম আমি। যে কাজে দুনিয়ার কোন ঝঞ্ঝাটে মাথা দিতে হবে না। সকালে যখন শুনলাম যে, এই কাজটা খালি হয়েছে, মনে মনে বললাম—কী ভাগ্যি যে, ঠিক এই সময়েই আমি পানামায় হাজির আছি! ভগবান যেন এই কাজটা পাইয়ে দেবার জন্যই আমায় এনে ফেলেছেন এখানে। এখন, মালিক, সবকিছু নির্ভর করছে আপনার মর্জির উপরে। বুড়োটাকে একটু শান্তির মুখ দেখতে দেওয়া না দেওয়া আপনারই ইচ্ছে।"

"আজকেই চাকরিতে বহাল হতে পারবে ত?"

"নিশ্চয়—"

"তা হলে যাও। চাকরি পেয়ে গেলে তুমি। তবে মনে রেখো, কাজে গাফিলতি হলে কিন্তু তক্ষুণি যাবে চাকরি।"

"তা ত অবশ্যই—"

সন্ধ্যা যখন হল, সমুদ্রের জল যথারীতি আজও ঝলমলিয়ে উঠল আলোক-স্তম্ভের অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভায়। স্ক্যাভিনস্কি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে লাইট-হাউসের।

রাত্রি শান্ত নিস্তব্ধ। নির্ভেজাল গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত্রি। স্বচ্ছ কুয়াশা চারিদিকে। চাঁদের চারদিকে তা রচনা করেছে বিশাল বর্ণাঢ্য সুডৌল একখানি রামধনু। সমুদ্রবক্ষে চাঞ্চল্য যা-কিছু, তা শুধু জোয়ারের। সেখান থেকে উপর পানে তাকাবার যদি কেউ থাকত, স্তম্ভের ঝুলবারান্দায় সে দেখতে পেত কালো একটা বিন্দুকে। সেই বিন্দুই স্ক্যাভিনস্কি।

স্ক্যাভিনস্কি দাঁড়িয়ে আছে আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে। নিজের বর্তমান অবস্থাটা পুরোপুরি উপলব্ধির ভিতর আনবার চেষ্টা করছে। আনা সহজ নয়, কারণ মনের উপর ঘটনাপরম্পরার চাপ আজ যেন বড্ডো বেশী দুর্বহ লাগছে। বনের পশু শিকারীর হাত থেকে পালিয়েছে কোন রকমে, দৈবাৎ একটা নিরাপদ আশ্রয় মিলে যেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে সেখানে, পেরিয়ে আসা বিপদগুলির স্মৃতি এখনো গায়ে কাঁটা জাগিয়ে তুলছে যেন। সমুদ্রচারী জাহাজ পড়েছিল একটানা ঝড়ের মুখে, তার মাস্তুল ভেঙেছে, দড়ি-দড়া ছিঁড়েছে, পাল সব দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে উড়ে গিয়েছে আকাশের চারদিকে। পাহাড় সমান

ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে তার উপরে, পাতাল সমান গভীরে নামতে নামতে তার মনে হয়েছে, আর বুঝি সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসতেই সে পারবে না।

তবু সে উঠে এল শেষ পর্যন্ত। উঠে এল লাইট-হাউসের এই তুঙ্গশীর্ষে। তাই ভাল, যার শেষ ভাল। অতীতের কথা আজ সে ভুলে যেতে পারবে, সমুখে ঐ শান্তি পারাবার।

তার দীর্ঘ জীবনের অফুরন্ত অভিজ্ঞতার সামান্যই সে বলেছে ফকনব্রিজকে। বেশির ভাগই হয়নি বলা। বলার দরকারও ছিল না, সময়ও ছিল না। অফুরন্ত অভিজ্ঞতা! কিন্তু প্রতিবারের অভিজ্ঞতাই যেন এক সুরে বাঁধা। "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।" যতবারই সে খুঁটি গেড়ে বসেছে 'আর এখান থেকে নড়ব না' সংকল্প করে, ততবারই এসেছে আচমকা একটা প্রলয়ঝঞ্ঝা। তার কুঁড়ে ঘরের চাল উড়িয়ে দিয়ে, তার উনুনের আগুন নিবিয়ে দিয়ে, তাকেই সশরীরে নিক্ষেপ করেছে দূরদূরান্তের অচিন কোন্ মুলুকে।

আলোক-স্তম্ভের ঝুলবারান্দা থেকে আলো-কোজ্জ্বল অপার জলধির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সারাজীবনের সহস্রমুখী কর্মধারাকে সে যেন আর একবার দেখতে পেল মানসচক্ষুর সমুখে নানা-খাতে প্রবাহিত। দুনিয়ার প্রতি অংশে সে বিচরণ করেছে, হেন কাজ নেই যা কখনো না কখনো করেনি। অস্ট্রেলিয়ায় সোনা তুলেছে খনি থেকে, আফ্রিকার খনি থেকে তুলেছে হীরা। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সরকারের তরফে করেছে গোলন্দাজি (ওসব অঞ্চলে বেসরকারী গোলন্দাজও বহু আছে), কালিফোর্নিয়ায় গড়ে তুলেছে পশুপালনের খামার। সে খামার জ্বলে পুড়ে গেল এক অনাবৃষ্টির বছরে। ব্রেজিলে গিয়ে নদী পথে-

—"তা হলে যাও। চাকরি পেয়ে গেলে তুমি।" [পৃষ্ঠা ৩৭২

পথে বাণিজ্য শুরু করেছে বুনো জাতিদের সঙ্গে। তার বজরা বানচাল হয়ে গেল আমাজনের বুকে। তার জীবনের চরমতম সংকট ছিল সেইটিই। আমাজনের তীরের আদিম অরণ্যে অনেক সপ্তাহ তাকে দিগ্‌ভোলা হয়ে ঘুরতে হয়েছে শুধু বনফল খেয়ে খেয়ে, অস্ত্রহীন, প্রায় উলঙ্গ, প্রতি পদে হিংস্র শ্বাপদের উদরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা মাথায় নিয়ে নিয়ে।

তারপর আর্কানসাসের হেলেনাতে গিয়ে সে খুলেছে এক কামারশাল। না, সেবারকার লোকসানটা একা ওরই লোকসান ছিল না, গোটা শহরটাই পুড়ে গিয়েছিল এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে। ওর ক্ষুদ্র কামারশাল আর রেহাই পাবে কেমন করে? তারপর রকী পর্বতে সে পতিত হয়েছে নরখাদক রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে। নিতান্ত দৈবানুগ্রহেই একদল কানাডাবাসী শিকারী এসে

পড়েছিল সেই সময়ে, তারাই উদ্ধার করে ওকে। তারপর এক করাসী বাণিজ্য জাহাজে দুই বছর এবং এক নরওয়েজীয় তিমি-ধরা জাহাজে তিন বছর করেছে নাবিকের কাজ। দুইবারই জাহাজডুবি হয়ে মরতে-মরতে রক্ষা পেয়েছিল কোন রকমে। হাভানায় চুরুটের কারখানা ফেঁদেছে শেষমেষ, সেখানে যখন সে ম্যালেরিয়ায় হতচৈতন্য, তার অংশীদার চম্পট দিয়েছিল সব তহবিলটা আত্মসাৎ করে।

সেইখান থেকেই সে এসে পড়েছে এই অ্যাস্‌পিনওয়ালে। এই পাহাড়-দ্বীপের পাঁচশো ফুট উঁচু স্তম্ভের মাথায় এইবার আঁক দেখি, কোন্ নতুন বিপদ তাকে গ্রাস করতে আসে। আর নয়, আর নয়। বঞ্চিত, বিড়ম্বিত হওয়ার পালা সাঙ্গ হয়েছে তার। জীবনের বাকী কয়টা দিন এইখানেই সে কাটিয়ে যাবে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

ক্ষোভ? অতীত ব্যর্থতার জন্য? তা না থাকবে কেন? এমন ভাগ্য নিয়েও কেউ জন্মায় পৃথিবীতে? ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুৎ সবাই চিরদিন বিরোধিতা করেছে তার। পরিচিত লোকেরা চিরদিন বলাবলি করেছে—'লোকটা দুর্ভাগা'। শুনে শুনে স্ক্যাভিনস্কিরও বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে, সে দুর্ভাগা। তা হোক! বিরূপ ভাগ্য আর কত বিড়ম্বিত করবে তাকে? অশিব শক্তি ত আর অসীম শক্তি হতে পারে না!

অন্ততঃ তাই বিশ্বাস ওর। অ্যাস্‌পিনওয়ালের এই আলোক-স্তম্ভের আশ্রয় পাওয়ার পরে তার সে বিশ্বাস আরও জোরালো হয়ে উঠছে। যে-দুর্বলতা মন্দ ভাগ্য তাকে পৃথিবীময় তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে এতদিন, এবার তাকে নিরস্ত হতেই হবে। এই আলোক-স্তম্ভের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে তাকে তাড়িয়ে বার করে বহির্বিশ্বের সহস্র সংকটের মাঝে আবারও নিক্ষেপ করা—এ-সাধ্য নিশ্চয়ই নেই নিষ্করুণা নিয়তির।

বিশ্রাম! বিশ্রাম! যা সারা জীবন নাগালের বাইরে ছিল, এবার তা এসেছে আয়ত্তের ভিতরে। আমরণ তাকে আর আয়ত্তের বাইরে যেতে দিচ্ছে না স্ক্যাভিনস্কি।

দিনের পরে দিন কেটে যায়, মাসের পরে মাস। দিনে একবার কয়েক মিনিটের জন্য মানুষের মুখ দেখতে পায় স্ক্যাভিনস্কি। উপকূলরক্ষী জনসন তার খাবার নিয়ে আসে নৌকোয় করে। তার সঙ্গে কোনদিন দু'টো কথা বলে, কোনদিন বলেও না। ভাল লাগে না বলতে। রবিবার সকালে ঐ নৌকোই তাকে নিয়ে যেতে পারে উপকূলের ক্রিওল-বস্তির গির্জায়।* কয়েক রবিবার সে গিয়েছিলও, আর যায় না এখন। লাগে না ভাল।

ভাল লাগে তার চেয়ে গাঙ-চিলদের সঙ্গে মেলামেশা করতে। স্তম্ভ-চূড়ায় বিশাল উপনিবেশ ওদের। এখানে এসে অবধি স্ক্যাভিনস্কি নিত্য ওদের মধ্যে খাবার বিতরণ করে। নিজে কম খেয়েও ওদের খাওয়ায়। তার ফলে ওরা এখন দারুণ রকম পোষ মেনেছে ওর। ওর হাঁক শুনতে পেলেই শত শত গাঙ-চিল এসে সারি বেঁধে বসে যায় স্তম্ভ-মূলের পাথুরে মাটিতে। স্ক্যাভিনস্কি তাদের মধ্যে ঘুরতে থাকে রুটির টুকরো, গমের দানা, মাংসের হাড় দরাজ হাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। এতে তার খরচাও হয় বিলক্ষণ। তা হোক, মাইনেটা ত সবই জমে তার! নিজের খরচা আর কী?

বেশ কেটেছে কয়েক মাস। সারা জীবনই বেশ কাটবে এই ভাবে, তাতে সন্দেহ কী?

এক সকালে তার স্তম্ভ থেকে নামতে দেরি হয়েছিল। নামল যখন, খাবার নামিয়ে দিয়ে

* আধা-স্পেনিশ আধা-নিগ্রো সঙ্কর জাতি।

জনসনের নৌকা ফিরে গিয়েছে উপকূলে। ঐ যে উঁচু পাথরখানার উপরে সাজানো আছে প্যাকেটগুলো। শক্ত ক্যানভাসের ব্যাগ, গাঙ-চিলদের সাধ্য নেই ছিঁড়ে ফেলবার।

কাছে গিয়ে কিন্তু অবাক্ হল স্ক্যাভিনস্কি। খাবারের তিনটি প্যাকেট ছাড়া আরও একটা প্যাকেট রয়েছে, এটায় মোড়ক কাগজের। কী এ? এখানে কে তাকে কী পাঠাল? মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল সে দ্রুতহস্তে। অবাক্! একখানা বই যে। নিউইয়র্কের প্রবাসী পোল সমিতি পাঠাচ্ছে তাকে এই বই।

হয়েছে। কিছুদিন আগে জনসন তাকে একখানা "পানামা হেরাল্ড" কাগজ কিনে এনে দিয়েছিল অ্যাসপিনওয়াল থেকে, তারই অনুরোধে অবশ্য। সেই কাগজে প্রবাসী পোলদের ঐ সমিতি গঠনের কথা জানতে পারে স্ক্যাভিনস্কি। আর তার পরদিনই জনসনের হাত দিয়ে পনেরো ডলার চাঁদা পাঠিয়ে দেয় সমিতিভুক্ত হওয়ার জন্য। তারপর সে কথা আর মনেও ছিল না ওর।

কিন্তু মনে ওর না থাকুক, সমিতি ঠিকই মনে রেখেছে। ইদানীং পোলাণ্ডের মহাকবি মিস্কিয়েভিচের কাব্যগ্রন্থমালার একটি সংস্করণ ওরা ছাপিয়েছে প্রবাসী পোলদের অন্তরে জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে রাখবার জন্য। সব সদস্যকেই এক এক খণ্ড বই তারা পাঠিয়েছে, বাদ পড়েনি স্ক্যাভিনস্কিও।

বই খুলেই মিস্কিয়েভিচের নাম দেখতে পেল ও। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেহে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ যেন খেলে গেল ওর। সেই মিস্কিয়েভিচ! বাল্যে-কৈশোরে যাঁর কবিতা আবৃত্তি করে করে গ্রামের পথ সরগরম রাখা নিত্যকর্ম ছিল স্ক্যাভিনস্কির আর তার বন্ধুদের। যৌবনাগমে যাঁর কবিতায় প্রেরণা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণের জন্য তাকে ঠেলে পাঠিয়েছিল হাঙ্গেরিতে। সারা পৃথিবী চষে বেড়াবার পরেও, আজও যাঁর কবিতার এক একটা পঙ্‌ক্তি স্বর্গীয় সংগীতের মূর্ছনা জাগিয়ে তোলে তার অন্তরে।

সেইখানে প্রস্তরাসনে বসেই সে পড়তে লেগে গেল। ভুলে ছিল। সারা জীবনই সে ভুলে ছিল তার জন্মভূমিকে। বহুনিপীড়িতা, বহুবিখণ্ডিতা, পরপদদলিতা দেশমাতাকে। অর্ধ শতাব্দীর বিস্মৃতির ঘোর আজ কেটে যাচ্ছে। পোলাণ্ডের অরণ্য পর্বত নদী নির্ঝর শ্যাম প্রান্তরের অসীম সৌন্দর্য মানসচক্ষুর সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ফুটে উঠছে আজ আবার।

যে তোমারে হারায়েছে, তোমার মহিমা
মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে হারাবার পরে।
স্বর্গাদপি গরীয়সী হে মোর জননি,
মন্দির-অঙ্গনে তব আর কি তাহারে
আবাহন করিবে না? বড় আশা মনে
জনম লভিনু যেথা অন্তিম শয়ন
রচিব সে পুণ্যভূমে, অরণ্য ছায়ায়
রণক্লান্ত অস্থিগুলি লভিবে বিশ্রাম।

পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়! ছত্রে ছত্রে এ যেন স্ক্যাভিনস্কিরই নিজস্ব হৃদয়োচ্ছ্বাস। পড়তে পড়তে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ও। গাঙ-চিলেরা নিয়মিত সময়ে এসে জুটেছে তার পাশে, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে খাবারের জন্য। দু'চোখ বইয়ের উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে খাবারের প্যাকেট থেকে রুটি, মাংস, বিস্কুট সব সে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে পোষ্যদের। নিজের জন্য যে কিছুই রইল না, তা আর খেয়াল নেই তার।

গাঙ-চিলেরা খেয়ে চলে গিয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এল তবু বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে স্ক্যাভিনস্কি। চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছু, তবু তাকিয়ে আছে বইয়ের পাতায় ছাপার হরফ

আর সে দেখছে না, দেখছে জলজ্যান্ত তার স্বদেশকে, পাহাড়ে জঙ্গলে-ঢাকা বীর পিতৃপুরুষগণের রক্তে রক্তে পিচ্ছিল চিরনির্যাতিত পোলাণ্ডকে। বিচূর্ণ দুর্গপ্রাকারে, বিধ্বস্ত নগরে গ্রামে প্রতিধ্বনি শুনছে যুগযুগান্তের রণদুন্দুভির।

এই যে তার নিজের গ্রাম। তার চোখের সমুখেই। দেওদার বনের সনসন, মৃদুগামিনী তটিনীর কলস্বন। ঐ যে আইভিলতায় ঢাকা ছোট গির্জাটি। ঐ যে হাটতলা, ঐ যে পাঠশালা, যে-পাঠশালায় সে পড়েছে একদিন। ঐ ত! তার নিজেরই বাড়ি ঐ ত! তার বাবা ঐ গাই দুইছেন, তার মা খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছেন হাঁস মুরগীদের—

ধ্যানস্থের মত সারা রাত বসে আছে স্ক্যাভিনস্কি, দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অবিরত। ধ্যান ভাঙল পরদিন সকালে জনলনের ডাকাডাকিতে। "কী হয়েছে তোমার? রাতে আলো জ্বালনি কেন? একখানা জাহাজ চড়ায় আটকে গিয়েছে। চল কন্‌সালের কাছে।"

কন্‌সালের কাছে যেতে হল স্ক্যাভিনস্কিকে। চাকরি গেল তার। আবার ভেসে চলল অভাগা, দূরে দূরান্তরে অজানা দেশে। পোলাণ্ডে যাবে? বুঝতে পারছে না। মিস্কিয়েভিচের বই বুকের ভিতরই আছে বটে, কিন্তু মিস্কিয়েভিচের দেশও এই অভাগাকে বিশ্রাম দিতে পারবে কি না, কে জানে। ভাগ্য যে বিরূপ!*

* হেনরিক সিয়েনকুইজ-এর "দ্য লাইটহাউস-কীপার অব অ্যাসপিনওয়াল" অবলম্বনে।

বল ত সাপটা কি দেখে ভয় পেয়েছে?

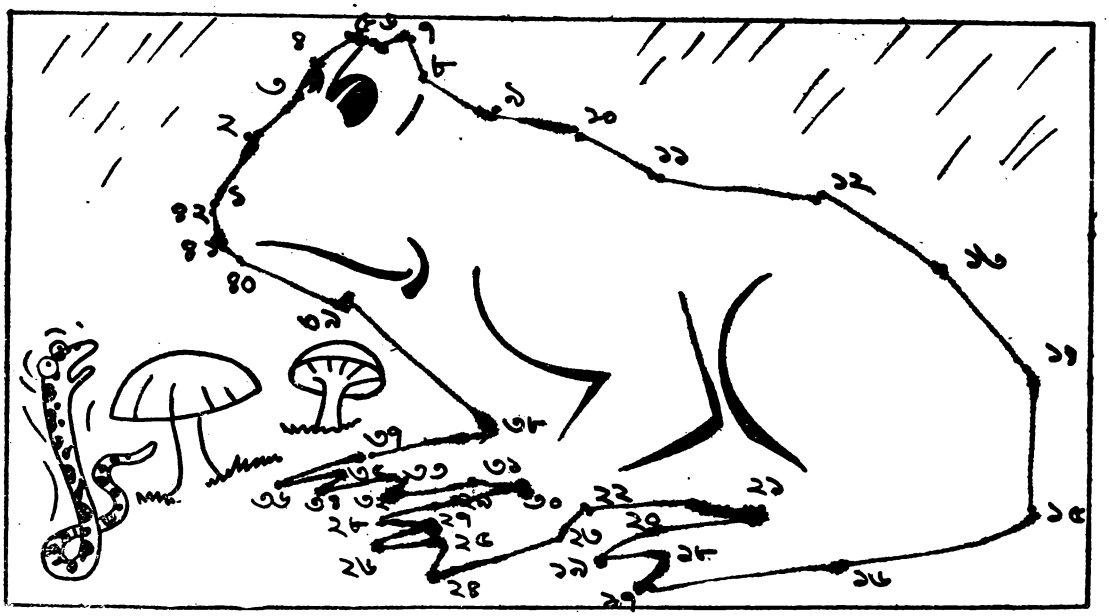

না পারলে ১ থেকে ৪২ পর্যন্ত ফুটকিগুলো পর পর লাইন টেনে যোগ কর।

পূরবী দেবী

কাহিনীটা আজকের নয়। যখনকার কথা বলছি তখন স্টীমে চলা জাহাজের আবির্ভাব হয়নি। পালতোলা জাহাজই ছিল সাগর পারাপারের একমাত্র উপায়। সেই সময়ে একটা জাহাজ সাগরপাড়ি দিচ্ছিল। সাগর পার হয়ে কূলে ভিড়তে আরো চার পাঁচ দিন দেরি আছে। এমন সময়ে জাহাজের ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই কেবিনে থাকত জাহাজের সূত্রধর বৃদ্ধ হ্যারিংটন। ক'দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি কেবিনের মধ্যে।

কেবিনের বাইরে তখন ভিড় করে অপেক্ষা করছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য নাবিকরা। ডাক্তার বেরিয়ে আসতে সকলে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তাদের মৌন দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কেমন আছেন আমাদের বুড়ো সূত্রধর-মশাই? ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, না আর ওকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। এবার লোকটা সত্যি সত্যি মারা গেল।

বুড়ো হ্যারিংটনকে সকলেই ভালবাসত। সে আর বেঁচে নেই শুনে সকলেই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। জাহাজের নিয়ম হল, জাহাজের ওপরে মাঝ-সাগরে যদি কেউ মারা যায়, তাকে সলিল সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু বুড়োকে সকলেই ভালবাসত। তাই ক্যাপ্টেন বললেন, আর চারদিন বাদেই জাহাজ গিয়ে কূলে ভিড়বে। তাই আর বুড়ো হ্যারিংটনকে জলে না ফেলে দিয়ে ডাঙ্গায় কবর দেওয়া হবে। এই চারদিন বুড়ো ঐ কেবিনেই থাকবে, আর একজন করে নাবিক সবসময়ে ঐ কেবিনের সামনে পাহারা দেবে।

বুড়ো হ্যারিংটনের মৃত্যুর পর তার কেবিনের সামনে ক্যাপ্টেনের আদেশমত নিয়ম করে একজন নাবিক পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। আশা করা গেছল চারদিনের দিন ডাঙ্গা জমির দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু এ অনুমান সফল হল না। বিপরীত বায়ুর চাপে জাহাজটা কূল থেকে অনেক দূরে সাগরের মধ্যে সরে গেল। শীগ্‌গির কূলে ভিড়বার আর সম্ভাবনা রইল না। তখন ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন আর হ্যারিংটনের মৃতদেহ পচিয়ে রেখে লাভ নেই।

আজ রাত পোয়ালেই কাল সকালে আমরা ঐ মৃতদেহ সলিলে সমাধি দেব।

সেদিন রাত্রে জন কেবিনের সামনে পাহারায় ছিল। সামনের জাহাজের মাস্তুল থেকে বেরোন একটা কাঠের কড়িতে পেরেকের গায়ে একটা লণ্ঠন ঝোলান ছিল। লণ্ঠন থেকে ভালো করে আলো আসছিল না। আলোটা বাড়াবার জন্যে জন উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের পলতে বাড়ানো কলে হাত দিতেই দড়াম করে একটা শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বৃদ্ধ হ্যারিংটনের কেবিনের দরজা দুটো হাট করে খোলা। দরজাটা এমনভাবে বন্ধ ছিল যে, ভেতর থেকে জোর করে ঠেলা না দিলে খুলত না। অত শক্ত করে বন্ধ করা দরজা হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে খুলে যাওয়ায় জনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে তো কেউ নেই। তবে কি করে খুলল? তবে কি—। নানারকম সম্ভব অসম্ভব চিন্তা মুহূর্তমধ্যে তার মাথার ভিতর দিয়ে ঘুরে গেল। ভাল করে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই গুরুভার কণ্ঠস্বরে কেবিনের ভেতর থেকে শব্দ এল, আলো দেখাও। তারপরই চলাফেরার পায়ের শব্দ।

জন চমকে উঠল। তার হাত লেগে লণ্ঠন ঝোলান পেরেকটা ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটাও পড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

জন আর দাঁড়াতে পারলে না। সে পেছন ফিরে বড় বড় পা ফেলে উঁচু ডেকে ওঠার সিঁড়ি বয়ে তিন লাফে উঠে এল। তার পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই আঁতকে উঠল। একটা দীর্ঘ সাত ফুট লম্বা লোক বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ির দিকে আসছে। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে জন তো পোঁ পোঁ দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি নাবিক শুয়ে ছিল। অনেকে ঘুমোচ্ছিল, আবার কেউ কেউ জেগে বসেছিল। তারা নীল আকাশের বুকে চাঁদের দৌড়-ঝাঁপ দেখছিল মেঘের মধ্যে দিয়ে। তারা জনের পায়ের শব্দ পেয়ে সেদিকে ফিরে তাকালে। তার পরই তাদের চোখ পড়ল জনের পেছনে একটু দূরে ডেকের বারান্দার ধারে। সেখানে বারান্দার ধার ঘেঁষে হ্যারিংটনবেশী একটা লোক বড় বড় পা ফেলে ডেকের ধারে পায়চারি করছে। এই ভাবে বুড়ো হ্যারিংটন আগে পায়চারি করতেন।

বুড়োকে দেখে জেগে থাকা নাবিকদের মনটা কেমন যেন ভয় ভয় করে উঠল। গা ছমছম করে উঠল। তারা আর সেখানে বসে অপেক্ষা করতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জাহাজ পরিচালনার ঘরে এসে উঠল। জেগে থাকা লোকগুলির হুড়দাড়িয়ে ছুটে পালানোর শব্দ শুনে ঘুমন্ত লোকগুলির নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তারাও পূর্বোক্ত নাবিকদের পদানুসরণ করলে।

ডেক থেকে নাবিকদের হঠাৎ পরিচালনা ঘরে ঢুকতে দেখে লেফটেনাণ্ট নাবিক লরেন্স বিস্মিত হয়ে বললে, তোমরা দল বেঁধে একপাল ঝড়ো কাকের মত আমার ঘরে এলে কেন? যাও যাও, ডেকে যাও। সব পাগল হয়ে গেলে নাকি?

কেউ কোন উত্তর দিলে না। বরং আরো ঘেঁষে এগিয়ে এল সামনের দিকে।

তখন পরিচালক নাবিক বললে, কি, ব্যাপার কি? সব চুপচাপ যে?

তখন একজন নাবিক ফুসফুস করে বললে, ডেকের বারান্দার ধারে পায়চারি করছে। মুখে দাড়ি।

তার মানে!—পরিচালক বললে।

হ্যারিংটন—আরেকজন বললে, তাঁর গায়ে সেই কোট, দাড়িটা বুক অবধি ঝুলে আছে। পকেট থেকে ব্যাজের ফিতে অর্ধেক ঝুলে আছে। মনে হচ্ছে, সত্যি হ্যারিংটন ঘুরে বেড়াচ্ছে আগের মত।

যত সব কুসংস্কারে ভরা ভূত। চল চল, রাস্তা

দাও, দেখে আসি কি ব্যাপার।—লেফটেনাণ্ট বললে।

ভিড় করে দাঁড়ানো নাবিকরা দু'ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে পথ করে দিলে। পরিচালক গটগট করে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে লেফটেনাণ্ট সিঁড়ি দিয়ে ডেকের উপর নেমে এসে দেখে সত্যিই হ্যারিংটনের মত একটা লোক পেছনে হাত দিয়ে একবার এদিকে যাচ্ছে আবার ওদিকে যাচ্ছে। তার চলার ভঙ্গিটাও হ্যারিংটনের মত।

এই দেখে পরিচালকের গলা শুকিয়ে গেল। ভাল করে চোখ রগড়ে দেখলে, ভুল দেখছে না। তখন কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে বাধ বাধ স্বরে ডাকলে হ্যা···হ্যা···রিং···ট···ন, তুমি ?

পরিচালকের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর অভ্যস্ত হাতে সম্মান দেখিয়ে লেফটেনাণ্টের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে ধীর পায়ে। লোকটি যত এগোয় লেফটেনাণ্ট তত পেছোয়। সে কিছুতেই দুজনের মাঝের দূরত্ব কমাতে রাজী নয়। তারপর একটা বাঁকের কাছে এসে পিছন ফিরে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে ক্যাপ্টেনের ঘরে এসে দরজা ঠেলে ঢুকল। ক্যাপ্টেন তখন ঘুমোচ্ছিলেন। দরজা খোলার শব্দে জেগে উঠে দেখলেন লেফটেনাণ্ট এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি চাই ?

—হ্যারিংটনের ভূত !

—যাও পালাও। ভূতকে বলগে রাত্রে ঘুমোতে। জই বলে ক্যাপ্টেন নেশার ঘোরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

খানিক বাদে আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল।

ব্যাপারটা হয়েছিল যে, হ্যারিংটন অসুস্থ হবার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অজ্ঞান হয়ে দীর্ঘকাল পড়ে থাকা তার একটা রোগ ছিল। তখন তাকে দেখলে মরে গেছে বলে মনে হত। ডাক্তার সে খবর জানত না।

পরিচালকের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ঘুরে দাঁড়াল।

প্রায় চারদিন বেঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার পর তার যখন চেতনা হয় তখন ঢং ঢং করে দুটো বাজে। হ্যারিংটন তা শুনতে পেয়ে ভাবলে, সকাল হচ্ছে, উঠতে হবে। তাই অভ্যাস মত দু'হাতে কেবিনের দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলে—আলো দেখাও। তারপর তার পোশাক খুঁজতে থাকে। তখন তার পায়ের শব্দ জনের কানে যায়।

সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে, সলিল সমাধির আগের দিন হ্যারিংটনের চেতনা হল। তা না হলে সত্যিই তাঁকে অপঘাতে মরে ভূত হতে হত।

বাগারু মামার বুদ্ধি

শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

বিকেলবেলায় ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই চার ভাইবোনে ঝগড়া শুরু করেছে। ছেলে-মেয়েদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে তাদের মা ঘর থেকে বেরিয়ে কাকীমার ঘরে গিয়ে বসে আছেন।

অলোক বয়সে একটু ছোট। সে তার বড় দিদি অনিতার সঙ্গে ঝগড়ায় পারবে কেন? দু'এক-বার 'হ্যাঁ' আর 'হুঁ' করে একটা পুরোন মাসিক পত্রিকা খুলে হাঁদা-ভোঁদার ছবি দেখতে শুরু করলে।

অলোকের পৃষ্ঠ প্রদর্শন অশোকের মর্যাদায় আঘাত করলে। সে সবার থেকেই বড়। শুরু হয়ে গেল অনিতার সঙ্গে ঝগড়া। তর্ক যখন চরমে উঠেছে সেই সময়ে সবার ছোট ভাই অমল ঘরে ঢুকে রেডিওটা চালিয়ে দিল।

ঘরের মধ্যে একটা রীতিমত তাণ্ডব বিভীষিকা শুরু হল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্লাস্টিকের আধছেঁড়া একটা ব্যাগ হাতে করে ঘরে ঢুকলেন বাগারু মামা। ঘরে ঢুকেই রেডিওটার কান মলে দিলেন তিনি। কানমলা খেতেই রেডিওটা থেমে গেল। তারপর ব্যাগটাকে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের জুতো খুলতে লাগলেন।

বাগারু মামার আকস্মিক আগমনে অশোক আর অনীতা তাদের ঝগড়া মুলতুবি রেখে হৈ হৈ করে উঠল। এর মধ্যে বাগারু মামার জুতো খোলা হয়ে গেছে। সামনের আলনা থেকে জামাই-বাবুর লুঙ্গিটি নিয়ে মাথায় গলাচ্ছেন আর দৃষ্টিটা অমলকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। অমল ছেলে-মানুষ, তার সবতাতেই কৌতূহল। সে মামার ব্যাগটার মধ্যে কি আছে তা দেখবার কৌতূহলে সেখানে ঘুরঘুর করছিল।

হঠাৎ ঘরের পাশ থেকে হুলো বেড়ালের গরর গরর আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাপার কি দেখার জন্যে অশোক বাইরে বেরুবার চেষ্টা করতেই বাগারু মামার ডান হাতখানি তিষ্ঠ ভঙ্গিতে সাধুদের মত মাথার উপর উঠল। এক পা এগিয়েই অশোক দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারলে মামা তাকে যেতে বারণ করছেন।

এদিকে চতুর্দিক থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। বাগান থেকে গুবরে পোকার কিটির কিটির ক্রী-ই-ই ক্রী-ই-ই-ই আওয়াজে নিবিড় নির্জনতার স্তব্ধতা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। হঠাৎ অমল

চেঁচিয়ে উঠল 'মা' বলে, সঙ্গে সঙ্গে বাগারু মামা ধমক দিলেন, অ্যাই, চুপ। অশোক বলল, আলো জ্বালব?

'তাই জ্বালা' বলে বাগারু মামা ধাঁ করে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

মামা বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মামার বোন ছায়া দেবী ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশোক বলে উঠল, মা, মামা এসেছে!

ছায়া দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেল সে অন্ধকারে?

অনিতা উত্তর দিল, আমাদের আলো জ্বালাতে বলে একেবারে ভ্যানিস—অর্থাৎ অদৃশ্য।

ছেলেমেয়ের কথায় ছায়া দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, দেখ ত ছেলেটা কোথায় গেল এই অন্ধকারে।

একটু পরেই বাগারু মামা ঘরে ফিরে এলেন। মামা ফিরে আসায় সকলে মনে মনে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়লে। যদি আর একটু দেরি হত আসতে তাহলে মায় তাগিদে মামাকে গরু খোঁজা করতে বেরোতে হত। সকলকে চুপ করে থাকতে দেখে বাগারু মামা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তোরা সব বোবা হয়ে গেলি কেন রে। একটু বাইরে গেছিলাম বলে তোরা কি ভাবলি আমি হারিয়ে গেলাম? ফু! তাও আবার ছোট্ট এই বারাসাত শহরে! তারপর অশোক আর অনিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস?

মামার প্রশ্নে অশোক আর অনিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, বাগারু মামা আবার বললেন, তা পড়বি কেন? সেই সময়টুকু রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে গান শুনলে কাজ দেবে, কি বল!

কথায় রেশ টানতে টানতে বাগারু মামা বললেন, জানিস, ভারতবর্ষে এখন প্রতিদিনই বলতে গেলে কোন না কোন মন্দির থেকে হয় বিগ্রহ না হয় বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি যাচ্ছে। চুরির কিনারা করতে না পেরে সবাই হিমশিম খাচ্ছে। খবরের কাগজগুলো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তারস্বরে লিখে যাচ্ছে, চুরি করা এই সমস্ত বিগ্রহ আর অলঙ্কার পৃথিবীর ধনাশ্রেষ্ঠরা বহু মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে তাদের সংগ্রহশালা সাজাচ্ছে।

দেশের সবাই এই চুরির ব্যাপারে একেবারে বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত। দেশের সরকার ঘোষণা করেছেন যে, কেউ এই চোরেদের অথবা চুরি করা বিগ্রহ কিংবা বিগ্রহের অলঙ্কার সামগ্রীর খোঁজ দিতে পারবে তাকেই পুরস্কার দানে সম্মানিত করবেন।

কোন সভা সমিতিতে লিখিত ভাষণ পাঠের মত এই পর্যন্ত বলেই বাগারু মামা থেমে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা গমগম করছে। অমল ঘুমিয়ে পড়েছে মামার ব্যাগটার পাশে। অশোক, অনিতা আর অলোক বাক্‌হীন। এমন সময় আবার সেই হুলো বেড়ালের গরর গরর আওয়াজ শোনা গেল।

অলোক চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, যা, এই দাদা, বেড়ালে সব দুধটা খেয়ে গেল এবারে। ঠিক তখনই বাগারু মামা কথা কইলেন, বেড়াল এই ঘরের ত্রিসীমানায় কোথাও নেই।

অশোক আর অনিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল —তাহলে আওয়াজটা কিসের মামা?

—আমার টনসিল! মানে আমার টনসিলটা একটু বেড়েছে।—মামা বললেন।

ভাগ্নে ভাগ্নীরা নিজেদের মুখ চাওয়াচায়ি করছিল। হুলো বেড়ালের গরর গরর শব্দের সঙ্গে মামার টনসিলের একটা সামঞ্জস্য খুঁজছিল হয়ত।

ইতিমধ্যে ছায়া দেবী আবার ঘরে ফিরে এসেই সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তুই এসে

অবধি আমাকে একবার ডাকিসনি পর্যন্ত বাগারু! আর এসেই এই অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলি শুনি?

দিদির স্নেহের বকুনিতে বাগারু মামা কিঞ্চিৎ হাসতে চেষ্টা করলেন। আর তখনই আবার সেই হুলো বেড়ালের গর্র গর্র আওয়াজটা শোনা গেল।

ছায়া দেবী ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর গলার আওয়াজটা ওরকম হল কেন? ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস ত?

বাগারু মামা উত্তর দিলেন—মহাদেবশালে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ী ঠাণ্ডাটা লেগেছে।

—ঠাণ্ডা লেগেছে তো ঘরে থাকবি, না এই অন্ধকারে চরতে বেরোলি!

বাগারু মামা বললে, চরতে না দিদি, চোর ধরতে।

মামার কথা শেষ হতেই অশোক বলল, চোরের খোঁজ পেয়েছ নাকি মামা?

বাগারু মামা বললেন, এখনও পাইনি, তবে যাকে বলে গন্ধ পেয়েছি একটু।

অনিতা প্রশ্ন করল, বিগ্রহ চোরেরা গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে নাকি?

সদ্য 'ঘনাদা' পড়া অলোক বলে উঠল, ধ্যুৎ, দিদিটা একেবারে বোকা। গন্ধ পাওয়া মানে কিছু আন্দাজ করা।

অনিতা বলল, হরি হরি, তাই বল। আমি ভাবছিলুম মামা বুঝি পুলিস কুকুরদের কাছে তালিম নিতে গেছল।

বিগ্রহ চুরির ব্যাপারটা জমে উঠেছে। বাগারু মামা তন্ময় হয়ে গভীর কোন চিন্তার মাঝে সাঁতরে বেড়াচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে নিজের ডান হাতটিকে মেঝের উপর ঠুকছেন। সহসা ঘোর কেটে গেল তাঁর। মেঝেতে হাত ঠুকেই তিনি বললেন, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি শুনবি?

মামার স্বপ্ন দেখার সঙ্গে বিগ্রহ চোরের কি সম্পর্ক বুঝতে পারল না কেউ। সকলে জিজ্ঞাসা করল, কিসের স্বপ্ন মামা?

বাগারু মামা শুরু করলেন, মনে হল আমি কাবেরী নদীর তীর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যা নামছে। আবছা অন্ধকারে একটু দূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। চূড়াটা দেখেই বুঝতে পারলাম, অন্ততঃ দু' হাজার বছরের পুরানো মন্দির। নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। দ্রুত পদে এগিয়ে যাচ্ছিলাম নদীর কিনারা দিয়ে।

একে বিদেশ বিভূই, তায় নির্জন নদীর তীর। গা ছমছম করছিল। কিন্তু তোরা তো জানিস, ভয়ডর আমার চিরকালই কম। আকাশের গায়ে আলোটুকু সন্ধ্যার অন্ধকার গুষে নেবার আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে মন্দিরটায়। প্রায় পৌঁছে গেছি। আর মাত্র হাত কয়েক বাকী মন্দিরের সিঁড়ি ছুঁতে। এমন সময় লিকলিকে রোগা দুটি মূর্তি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাদের কাঁধে ঝোলান দুটো পুঁটুলি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে নদী-গর্ভে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশের গায়ে লেগে থাকা আলোটুকু ঘন অন্ধকারে ততক্ষণে আবরণে ঢাকা পড়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা করুণ কান্নার মেয়েলী সুর কানে এসে লাগল। কে যেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছিল, দেখলে তো? এমনি করে আমাদের সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এমন কি আমার সঙ্গীটিকেও বাদ দিলে না। কেউ ওদের কিছু বলছে না।

চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। কারুকেই

—বলছি দাঁড়া না। একটু হাঁফ ছাড়তে দিবি তো।

দেখতে পেলাম না। তখন সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের উদ্দেশ্যে বললাম, লিকলিকে লোক দুটো ত নদীগর্ভে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু ওদের গন্তব্যস্থলটি কোথায় সেটা কি বলতে পার? আশ্চর্য! সেই অদৃশ্য কণ্ঠ কথা বলে উঠল, নিশ্চয় বলতে পারি।

রাত অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র অমল চোখ বুজে নাক ডাকাচ্ছিল। কিন্তু বাগারু মামার কথা শুনে আর সব ভাগ্নে-ভাগ্নীদের চোখ থেকে ঘুম উধাও। তারা এক বিরাট রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। বাগারু মামা আসতেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, তারপর মামা?

খুশীর হাসি হেসে বাগারু মামা বললেন, বলছি দাঁড়া না। একটু হাঁফ ছাড়তে দিবি তো।

বাগারু মামা আবার বলতে শুরু করলেন—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দেবি! আমি ত আপনাকে চিনি না, দেখতেও পাচ্ছি না। তবু বলছি, আপনি কি চান আমিই ঐ দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বার করে জনসমক্ষে বিচারের জন্য হাজির করি? তাহলে আপনি দয়া করে আমাকে সব খুলে বলুন—অতঃপর ঐ দুষ্কৃতকারীরা কি করবে। কোথায় যাবে!

আবার সেই অদৃশ্য কণ্ঠ কথা বলে উঠলেন। আমাকে সেই জায়গাটার হদিস দিয়ে বললেন—ভাল করে মনে রেখ, সেই জায়গাটার হাত পঞ্চাশ ষাট দূরেই আছে অতি পুরাতন জীর্ণ একটি শিবমন্দির, আর তার অনতিদূরেই একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। আপাততঃ ঐ চোরেরা আমার সঙ্গীর মূর্তিটিকে পুঁতে রাখবে ঐ বটগাছের তলায়, আর অলঙ্কার ক'টি বিক্রি করে দেবে এক স্বর্ণকারের কাছে। এই সব কাজ আগামী অমাবস্যার রাতে ওরা করবে!

কারুর মুখে রা' নেই। বাগারু মামা বলে চলেছেন—এই পর্যন্ত বলেই অশরীরির কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল। ধড়ফড় করে উঠে তাঁকে খুঁজতে

গিয়ে একটা কিছু ভাঙ্গার শব্দে শিউরে উঠলাম। সেই শব্দে ঘুম ছুটে গেল। দেখলাম মাথার ধারে তোদের ফুলমামীর রেখে যাওয়া বেডটি-সুদ্ধ কাপ ডিশ দুটো মাটিতে ছিটকে পড়ে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে!

ঠিক এই সময়ে ছায়া দেবী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা এখন খাবি ত?

অশোক, অনিতা, আর অলোক সঙ্গে সঙ্গে বলল, আর একটু পরে। তারপর বাগারু মামার দিকে চেয়ে বললে, মামা, থেম না। বল।

বাগারু মামা বলতে শুরু করলেন, আমি ভেবেছিলাম, কাপ ডিশ ভাঙ্গার শব্দে তোদের ফুলমামী ছুটে আসবে। কিন্তু না, কেউ এল না। সে ভয় কেটে গেল। তারপরই আমি স্যুটকেশ খুলে লায়ভে অব ইণ্ডিয়ার পেল্লায় সেই ম্যাপটাকে নিয়ে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লাম।

তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সেই জায়গাটা। আর এক আধ ডিগ্রী এদিক ওদিক করতে করতেই আরও পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল চোখের সামনে একটুকরো ছাব!

অশোক, অনিতা আর অলোকের তিন জোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। এমন সময় আবার সেই হুলো বেড়ালের ডাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাগারু মামার মুখ থেকে নির্গত হল, জায়গাটা বারাসাত। তোদের দেশ, তোদেরই বাড়ির ঘেরা বাগান, আর শিব মন্দির। এবার মেপে দেখ, বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে কিনা?

কারুর মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। যেন সহসা উত্তর মেরু থেকে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে দার্জিলিং-এর ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা প্রচণ্ড হিমানী বাতাসে জমে গেছে সব। ওদিকে বাগারু মামা বলে চলেছেন, তোদের ফুলমামী পর্যন্ত জানে না, এখন আমার অবস্থান কোথায়। ম্যাপখানা ভাঁজ করে স্যুটকেশে ভরতে যেটুকু সময় লেগেছিল। তারপর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সোজা স্টেশনে। সেখান থেকে ডাউন বম্বে মেল ধরে একেবারে এখানে। ন'ঘণ্টা লেট ছিল গাড়ি, বুঝলি?

রাত যথেষ্ট হয়েছে। ছায়া দেবী সকলকে তাড়া দিচ্ছেন। সকালে আবার ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হবে। দিদির বকাবকিতে বাগারু মামা ভাগ্নে ভাগ্নীদের বললেন, এখন এই পর্যন্ত থাক, অনেক কাজ বাকী এখনও। আজ আবার সেই অমাবস্যার রাত। এতক্ষণে হয়ত অলঙ্কার-পত্তরগুলো বিক্রি করে এদিক পানেই পা বাড়িয়েছে ব্যাটারা। একটু এদিক ওদিক হলেই সব ভেস্তে যাবে। তোরা এবার খেয়েদেয়ে শুতে যা।

পরের দিন সকালে বাগারু মামা বাড়ি থেকে বে-পাত্তা! অশোক, অনিতা আর অলোক মনের মধ্যে খুঁত-খুঁতুনি নিয়ে যে যার ইস্কুলে চলে গেল। কোন রকমে পিরিয়ড ক'টা কাটিয়ে দে ছুট বাড়ির দিকে। অবশেষে বাগারু মামাকে দেখতে পেয়ে শান্ত হল সবাই।

বই খাতা রাখার তর সইছিল না। অলোক জিজ্ঞাসা করে ফেলল, রাত্তিরে কি হল মামা? ধরতে পেরেছো ব্যাটাদের? বাগারু মামার চোখ দুটো থেকে আশ্চর্য রকমের আলোর দ্যুতি বেরুচ্ছিল। ভাগ্নের কথায় একটু হেসে বললেন, জামা প্যান্ট বদলে কিছু মুখে দিয়ে সুস্থ হয়ে নে আগে, তারপর শুনবি।

জামা প্যান্ট বদল করতে যতটুকু সময় লাগে, তারপরই তিন ভাই-বোনে ঘিরে ধরল বাগারু মামাকে। অপরাহ্ণ বিলীন হতে তখনও কিছু দেরি। বাগারু মামা ভাগ্নে ভাগ্নীদের নিয়ে ঘরের মধ্যে বসেছেন গত রাতের লোমহর্ষক ঘটনার বিবৃতি দেবার জন্যে। তাঁর হাতের কাছে পড়ে আছে দেড় হাতের মত লম্বা কালো মতো দেখতে একটি জড় পদার্থ।

একটুখানি ভেবে নিয়ে বাগারু মামা কাহিনীটা বললেন, এইবার শুরু করি কেমন ?

কথায় খেই শেষ হবার আগেই ছায়া দেবী ঘরে ঢুকে বাগারু মামাকে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ফেললেন। অশোক, অমিতা, অলোক আর অমল মায়ের ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে চোখ কপালে তুলে বসে আছে। কিছুই বুঝতে পারছে না তারা।

ভারী জুতোর মসমস আওয়াজ শোনা গেল। বাইরে বারান্দা দিয়ে কারা যেন ঘরের দিকে আসছিল। দরজার দিকে তাকাতেই সকলে দেখতে পেল পুলিস। সবার পিছনে জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব ঘরের বাইরে থেকেই মামাকে প্রশ্ন করলেন, মূর্তিটাকে আপনি এখনই আমার হাতে সমর্পণ করুন। তারপর বললেন, ওটা কোন্ মন্দির থেকে উঠিয়ে এনেছেন মনে আছে কি ? আপনার সঙ্গে কে কে আর ছিল, তাদের নাম ঠিকানাটাও বলতে পারেন !

বাগারু মামা কিছু একটা বলতে গেলেন, কিন্তু ইনস্‌পেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, কিছু চেপে যাবার চেষ্টা করলে আমার পক্ষে আপনাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

বাগারু মামা সেই মিশকালো রং-এর জড় পদার্থটিকে তুলে নিয়ে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের হাতে দিলেন। বস্তুটিকে হাতে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, মাই গড্ ! এটা কি ? মূর্তিটা কোথায় ? এটা ত একটা বাঁকুড়া হর্স, এ সিম্পল টেরাকোটা !

আমতা আমতা গলায় বাগারু মামা বললেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ভারী খুশী হলুম জিনিসটা চিনতে পেরেছেন বলে। এমন সময় সকলের গলার স্বর ছাপিয়ে শোনা গেল বাগারু মামার মায়ের গলা। ঘরের বাইরে পুলিস দেখে তিনি জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাগারু নিশ্চয়ই বিনা টিকিটে আসতে গিয়ে ধরা পড়েছে ?

বাগারু মামার মাও যে ছেলেকে খুঁজতে চলে এসেছেন এতক্ষণ, আমাদের তা চোখে পড়ে নি। এরই মধ্যে অশোকের বন্ধু অমিতাভ অশোককে খুঁজতে এল। সেখানে সে তার বাবাকে পুলিসের পোশাক পরা অবস্থায় দেখে অবাক্ হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারল আসলে কি হয়েছে। অশোকের কাছ থেকে ইস্কুলে মূর্তি চুরির কথাটা শুনে সে তার বাবাকে বলেছিল।

অমিতাভ অশোককে বলল, তোর কাছ থেকে শুনে বাবার কাছে আমি গল্প করেছিলাম ভাই। অমিতাভর কথা কেড়ে নিয়ে অমিতাভর বাবা বললেন, হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমাকে আসতে হয়েছে। তুমি কি জান অশোকের জ্যাঠামশাই একজন সম্মানীয় ব্যক্তি ? কোথাও কিছু ঘটলে তাঁর অপযশ হবে কত ? দেশে এখন যে ভাবে মূর্তি চুরির হিড়িক তাতে কুড়িয়ে পাওয়া মূর্তিও বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর সেই জন্যেই আমাকে জিনিসটা দেখতে আসতে হয়েছিল। কথাগুলো বলেই অমিতাভর বাবা বেরিয়ে গেলেন।

ঘটনা আরও পরিষ্কার করে দিলেন বাগারু মামার মা। তিনি বললেন, বাগারু মামা ফুলমামীর ওপর রাগ করে কারুকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে এসেছেন।

অতঃপর সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। রাত্তিরের রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে চক্রধরপুরে ফিরে গেলেন বাগারু মামা তাঁর মায়ের সঙ্গে। যাবার আগে বলে গেলেন চুপি চুপি, পট্টি যখন মারবি দেখিস যেন তাতে ছেঁড়া ফাটা না বেরোয় !

৺সুধীর সরকার স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"র
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

প্রতিশোধ

নন্দিনী মণ্ডল

পৃথিবীর বুকে রাত্রির কালো ছোপ সবেমাত্র ঝরতে শুরু করেছে। মেঘের মালায় গাঁথা অস্ত-সূর্যের সোনালি মায়ার স্মৃতি মুছে যেতে যেতেও মুছে যায় নি। তার আগেই হাজার হাজার বাতি জ্বলে উঠেছে মহকুমা শহরের লোকালয়ে। বড় বড় চোখ ধাঁধান বাতিগুলো জ্বলছে হাসপাতালের গেটে, প্রবেশপথের দু'ধারে, মাঠে।

বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে এই হাসপাতাল। সবাই ব্যস্ত এখানে। ওপরে, নীচে, ঘরে, বারান্দায় নার্সদের নিয়মিত যাতায়াত। কোন কোন ঘরে মুমূর্ষু রোগীদের কাতরোক্তি।

বাগানে বাতির আলোয় সামনে সারি সারি ঝলমল করছে ডালিয়া, গোলাপ, বোগেনভিলা। একটি দুইটি করে কুঁড়ি-ফোটা জুঁইয়ের লতা ঝাড় থেকে বের হয়ে হাসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের একটা নির্দিষ্ট ঘরের কাঁচের শার্সিতে কান পেতে যেন খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছে ডাক্তার অরিন্দম রায়ের কথাগুলো।

—"সিস্টার, ব্লাডের মিল তো পাওয়া গেল না, তাই না?"

—"না ডক্টর! অনেক খোঁজা হল, কিন্তু এই রোগীর রক্তের সঙ্গে—"

—"হ্যাঁ, এক্ষুণি সদর হসপিটালে ট্রাঙ্কল করে জেনে নিন, এই গ্রুপের রক্ত আছে কিনা। যদি থাকে তবে রক্ত আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্ত এসে পৌঁছান চাই।"

ডাক্তারের সামনেই বেডে শুয়ে ছটফট করছে এক মুমূর্ষু রোগী। কাতরাচ্ছে—"আঃ, আঃ, ভগবান। কষ্ট! কষ্ট! ওঃ ওঃ ওঃ।"···চোখ দুটো বোজা। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে সমস্ত মুখ।

যন্ত্রণাকাতর মুখটা দেখতে দেখতে অরিন্দমের চোখে ছবির মত ভেসে উঠল একটা অতি পরিচিত সংসার-ছবি।···

অরিন্দম তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার জ্যাঠামশাই পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল সম্পত্তি একাই ভোগ করে চলেছেন। বাবা পশ্চিমবঙ্গের এক শহরে স্কুলের শিক্ষক। একদিন জ্যাঠামশাই ডেকে বললেন বাবাকে, "বিনয়, তোমার এখানকার সম্পত্তির অংশটুকু বদল করার ক্ষমতা যদি আমার নামে দিয়ে যাও তাহলে হিন্দুস্তানে কোন পার্টির সঙ্গে বদল করতে তোমার অবর্তমানেও কোন অসুবিধে হবে না। তারপর না হয় সুবিধেমত ভাগাভাগি করে নেয়া যাবে। কি বল?"

অরিন্দমের বাবা সরল মনে দাদাকে তাঁর অংশের পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নী দিয়ে ফিরে গেলেন হিন্দুস্থানে।

কিন্তু ছোট ভাইকে না জানিয়েই বিষয়-সম্পত্তি বদল করে সব কিছুর মালিক হয়ে বসলেন বড় ভাই, আর নামিয়ে দিলেন নিষ্ঠুর অন্ধকারের বোঝা ছোট ভাইয়ের সংসারে!

অরিন্দম বড় ছেলে। তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, মানুষের মত মানুষ করতে হবে। তা ছাড়া বরাবরই সে স্কুলের রেজাল্ট ভাল করে এগিয়ে চলেছে। সেই এগিয়ে চলার পথে অর্থের জন্য বিঘ্ন ঘটাবার পক্ষপাতি ছিলেন না তার বাবা।

ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তারি পড়বার যে ইচ্ছে ছিল অরিন্দমের, সেই ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

কিন্তু কোথায় পাবেন ডাক্তারি পড়াবার মত অর্থ? তবুও স্কুল মাস্টারি আর টিউশনির রোজগারে সংসার চালিয়ে ধার দেনা করে অতি কষ্টে চালাতে লাগলেন ছেলের পড়ার খরচ। তাকে জানতে দিলেন না সব কিছু।

অরিন্দম কোনদিনও ভুলতে পারবে না সেই দিনটির কথা—

সবেমাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে পাস করে বেরিয়েছে ও। বাবা ওকে সঙ্গে করে অনেক আশা নিয়ে বড় ভাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত পেতে চাইলেন সাহায্য, "দাদা, অরুর ডাক্তারি পড়ার খুব ইচ্ছে। রেজাল্টও ভাল করেছে। অথচ আমার সঙ্গতি তো জানোই। তুমি যদি সাহায্য কর তবে—"

কথাটা শেষ করতে পারেন নি অরিন্দমের বাবা। জ্যাঠামশাই উঠে গিয়েছিলেন, "আমি তো কিছু বলতে পারব না বিনয়, তোমার বৌদিকে বলে দেখ। যদি মত দেন, তাহলে—"

জেঠীমা বললেন, "আজকাল কে কার সংসারে সাহায্য করতে পারে বল ঠাকুরপো? আমার ছেলের এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।···তা এখন তো অনেক প্রাইমারী স্কুল খুলেছে। তারই একটাতে ঢুকিয়ে দাও না হয়। তোমারও সাহায্য হবে, বাড়তি খরচার জন্যও আর হাত পাততে হবে না কোথাও।"

মুহূর্তও আর দাঁড়াননি অরিন্দমের বাবা!

রোগীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ওঠে অরিন্দমের। বঞ্চিত, অপমানিত, অবহেলিত তার বাবা সামান্য

—"আপনি রক্ত দেবেন?" বিস্ময়বিমূঢ় নার্স। [পৃষ্ঠা ৩৮৮

আয়ে সংসার চালিয়ে ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অকালেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গেলেন, ছেলের পাস করে বেরোবার অনেক আগেই! মায়ের সিঁদুরমোছা অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের চোখের জল মুহূর্তে শক্ত হয়ে গিয়েছিল সেদিন, আর হৃদয় পরিণত হল পৃথিবীর বুক ফেটে বেরিয়ে আসা প্রতিহিংসার আগ্নেয়গিরিতে!

এই রোগীটা মরবে। রক্ত না পেলে নিশ্চয়ই মরবে। মরবে, মরুক তাহলে! এক্ষুণি ওর রক্ত

দরকার। রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে একটা পা একেবারেই গেছে। রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। ব্যাণ্ডেজ ভিজে গেছে রক্তে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে এখনও। গোঙাচ্ছে গোঙাক! জানুক—শয়তান পিশাচদের রক্ত দেবার মত রক্ত দুনিয়ায় কোথাও মেলে না! চোয়ালদুটো আরও কঠিন হয়ে ওঠে অরিন্দমের।

চমক ভাঙল নার্সের ডাকে—"ডক্টর!"

'ডক্টর'! 'ডক্টর'! ছোট্ট এই শব্দটি হাজার করতালি হয়ে বাজল ডাক্তার অরিন্দমের কানে। নিরুত্তর শূন্য দৃষ্টিতে চাইল সে।

—"এইমাত্র ট্রাঙ্কল এল, শহর হসপিটালেও এই রোগীর গ্রুপের রক্ত নেই।"

মুহূর্তকাল সমস্ত ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা। তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে গমগম করে উঠল অরিন্দমের কণ্ঠস্বর—"রক্ত নেবার ব্যবস্থা করুন। আমিই রক্ত দেব!"

—"আপনি রক্ত দেবেন?" বিস্ময়বিমূঢ় নার্স।

—"আমার রক্ত আগেই পরীক্ষা করা আছে। এই রোগীর রক্তের সঙ্গে আমার রক্ত মিলবে। এক্ষুণি রক্ত নেবার ব্যবস্থা করুন।"

পরদিন সকালে দুর্বল শরীরেই রোগীর সামনে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করে চলেছে ডাক্তার অরিন্দম রায়।

স্থির সুস্থির চোখ দুটো মেলে জ্যাঠামশাই চেয়ে আছেন ভাইপো অরিন্দমের দিকে!

অরিন্দমের চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি। যীশু বলছেন—"প্রভু, তুমি ওদের ভালবেসো, তুমি ওদের ক্ষমা কোরো!"

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম নিবাসী শ্রীসুজিতকুমার মিত্র তাঁর স্বর্গগতা ছোট বোন বুলবুল মিত্রের পুণ্য-স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺বুলবুল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :
একটি স্মরণীয় দানশীলতার মৌলিক কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী কার্তিক সংখ্যা ১৩৮৩ শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার—২০·০০ টাকা ❋ **দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫·০০ টাকা**

"সুধীর সরকার স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সুনন্ত এবং আমি

সুতপা গুপ্তা

সুনন্তর কথা লিখতে বসলেই বড় কষ্ট হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর মায়াভরা বড় বড় চোখদুটি। আমাদের বাড়িতে একটা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছিল। তাতে রামের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবিও ছিল। আমার মনে হতো সুনন্তর চোখদুটি ঠিক রামের মত। দিশাহীন অকূল দরিয়ার মাঝে যেন একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু। ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসে মনটা ভরে উঠতো। সুনন্তর চেহারাটি বেশ ছিল। রোগা রোগা লম্বাটে গড়ন, মাথাভর্তি কালো চুল। গায়ের রং ছিল কাঁচা সোনার মত। কথা বলতো খুব আস্তে।

সুনন্তর বাবা উকিল ছিলেন। বেশ ভাল পয়সা ছিল ওদের। সুনন্তর মা ওর ছোটবেলাতেই মারা যায়। আমি সুনন্তকে কোনদিন গাড়িতে স্কুলে আসতে দেখিনি। ওদের ফিটন ছিল। আমার বাবার ছিল তেলের কারবার। আমি রোজ জুড়ি গাড়িতে চেপে স্কুলে যেতাম।

আমি সুনন্তকে কোনদিনই সহ্য করতে পারতাম না। সুনন্ত ভাল ছেলে ছিল। মাস্টারমশাইরা বলতেন 'স্কুলের রত্ন'। আমার মনটা ঈর্ষায় ভরে উঠতো। পড়াশুনায় আমি খারাপ ছিলাম। মাস্টারমশাইরা হাসাহাসি করতেন। বলতেন— 'ওটা একটা সোনার গাধা।'

আমি সুনন্তকে জব্দ করার চেষ্টা করতাম। রোজ রোজ টিফিনের সময় ক্লাসের ছেলেদের খাওয়াতাম, জমির শাকসবজি পাঠাতাম মাস্টার মশাইদের বাড়িতে। পয়সা ছড়ানোয় কিছু ছেলে আমার দিকে এসেও ছিল।

একদিন টিফিনের সময় আমরা সবাই খাচ্ছি, হাবুল বললো, 'আমি এবার যাই রে, একটু সুনন্তর কাছে যাবো।'

আমি তীব্রস্বরে বললাম, 'কেন? সুনন্তর কাছে কেন?'

হাবুল বললো, 'পরীক্ষা তো প্রায় এসে গেল, মাইনা না দিলে টেস্টে বসতে দেবে না। তাই সুনন্তর কাছ থেকে টাকাটা আনতে যাবো।'

হিংসায় আমার সমস্ত গা জ্বলে উঠলো। চোখ পাকিয়ে বললাম, 'কত টাকা তোর জমেছে যে সুনন্তর কাছে যেতে হবে? শান্তশীল চ্যাটার্জী এখনো মরেনি। বল, কত টাকা তোর চাই?'

হাবুল বললো, 'পনের টাকা।' তারপর মিনমিন করে বললো, 'না, শুধু আমাকেই না, সুনন্ত দরকার হলে সবাইকেই মাঝে মাঝে দেয়।'

আমি পনের টাকা বের করে হাবুলের হাতে দিলাম। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'টাকার দরকার হলে আমার কাছে আসবে। কেউ যদি সুনন্তর কাছে যাও তাহলে তার একদিন কি আমারই একদিন।'

এরপর হঠাৎ একদিন বিমলেন্দু খবর নিয়ে এলো যে, ডোমপাড়ায় চাঁডালদের নিয়ে স্কুল করেছে সুনন্ত। রোজ বিকালে সে ওখানে যায়। চাঁড়াল মেয়েদের হাতে মুড়ি তেলেভাজা খায় আর দিগম্বর প্রায় ১৫।১৬টা ছেলেকে বর্ণপরিচয় পড়ায়।

—'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

আমার মাথায় নতুন ফন্দি এল। পরদিন স্কুলে গিয়ে কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দিলাম না। হেড মাস্টারমশাই ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কি ব্যাপার? তোমরা ক্লাসে যাওনি কেন?'

পয়সার গরম ছিল বলে আমার সাহসও ছিল দুর্জয়। আমি উত্তর দিলাম, 'সুনন্ত স্কুলে থাকলে আমরা ক্লাসে বসবো না। ও আজকাল চাঁড়ালদের সঙ্গে মিশছে, তাদের হাতে খাচ্ছে, আর তা ছাড়া নেশাও করে।'

সব শুনে হেড স্যার সুনন্তকে ডাকালেন। আমি জানতাম, চাঁড়াল পাড়ায় যাবার কথা সুনন্ত অস্বীকার করবে না। জীবনে কোনদিন সুনন্ত মিথ্যা কথা বলে না।

হেড স্যার বাজখাঁই গলায় বললেন, 'সুনন্ত, তুমি আজকাল চাঁড়াল পাড়ায় যাচ্ছ?'

সুনন্ত বললো—'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু কেন?'

হেড স্যার গলা সপ্তমে তুলে বললেন, 'তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে! আজকাল নেশা করতে শিখেছ? দিনরাত ওদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছ?'

সুনন্ত শান্ত গলায় শুধু বললো, 'আমি কোন অন্যায় কাজ করি না।'

হেড স্যার আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। কুলাঙ্গার কোথাকার।'

সুনন্ত চলে গেল। চাঁড়ালপাড়া অবশ্য ছাড়লো না, কিন্তু স্কুল ছাড়লো। সেই যে গেল আর ফিরে এল না। শুনলাম প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। আমার আনন্দ আর তখন কে দেখে। আমি তখন পুরোপুরি হিরো। এরপর অনেকদিন সুনন্তর খবর পাইনি। এদিকে আমাদের পরীক্ষাও এসে গেল। সেবার আমাদের হোম সেন্টারে সীট পড়েছিল। অঙ্ক পরীক্ষার দিন টুকতে গিয়ে আমি ধরা পড়লাম। হেড স্যার এসে খাতা কেড়ে নিলেন। রাগে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে গেল। প্রতিশোধ নেবার জন্য মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। হেড স্যারের বাড়ি ছিল আমাদের পাড়ার উত্তর প্রান্তে। ওদিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। হেড স্যারের কাঁচা বাড়ি। মুলি বাঁশের 'বেড়া আর গোলপাতায় ছাওয়া দুখানি ঘর। সেই রাত্রেই তিন চারজন সঙ্গী জুটিয়ে হেড স্যারের বাড়িতে আগুন দিলাম, বাইরে থেকে শিকল টেনে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আগুন দেখে সব বাড়ি থেকে কিছু কিছু লোকজন বালতি নিয়ে ছুটে আসছিল। আমার মাথায় তখন খুনের নেশা চেপে গিয়েছিল। হাতে একটা লোহার

ডাণ্ডা নিয়ে আমি রুখে দাঁড়ালাম। কর্কশ ভাবে বললাম, ও বাড়ির দিকে যে যাবে মাথা ভাঙ্গবো তার এই ডাণ্ডা দিয়ে।

হঠাৎ দেখি সুনন্ত তীরের মত ছুটে আসছে। আমার মুখে ক্ষুধার্ত হায়নার হাসি ফুটে উঠলো। সুনন্তর হাতে আগুন নেভাবার জন্য একটা বাঁশের লাঠি। আমি হাঁকলাম, 'খবরদার সুনন্ত, এগুবি না, এগুলেই মাথা ভাঙ্গবো।'

সুনন্তর রোগা শরীরটা টান টান হয়ে উঠলো। ক্ষীপ্র হাতে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, 'তোমার নিজের মাথা বাঁচাও শান্তশীল।'

সুনন্ত যে এত ভাল লাঠি খেলে জানতাম না। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়লাম! ততক্ষণে পাড়ার লোকেদের সাহায্যে হেড স্যার বেরিয়ে এসেছেন। বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমার সঙ্গীরাও সব ধরা পড়েছে। হঠাৎ হেড স্যার চিৎকার করে উঠলেন, 'সুনন্ত, তোমার মাসীমা ভিতরে রয়েছেন, চোখে দেখতে পান না, সর্বনাশ হবে যে?'

মুহূর্তে সুনন্ত তীরের মত জ্বলন্ত বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল। সুনন্তকে সাহায্য করার জন্য অনেকেই এগিয়ে গেল। বাড়িটা তখন জ্বলে জ্বলে ভেঙ্গে পড়ছে। মাসীমাকে যখন বের করা হলো, উনি তখন অজ্ঞান। সুনন্ত বের হতে পারলো না। বেরুবার মুখেই চাল ভেঙ্গে পড়লো! বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন সুনন্তকে বার করা হলো তখন ওর সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। বাঁচাবার আশা নেই। সুনন্তর অবস্থা দেখে সবাই খেপে উঠলো। এলোপাতাড়ি লাঠি পড়লো আমাদের উপর। কে একজন বললো, 'ওদের পুলিসে দাও'। হেড স্যার বললেন, 'শেষ করে ফেল ওদের'।

সুনন্তর তখনো জ্ঞান ছিল। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে ওর জীবনের শেষ কথাটি বলে গেল। এবারও আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল। হেড স্যারকে ডেকে সুনন্ত বললেন, 'স্যার, আপনি শান্তশীলকে ক্ষমা করুন। আমি চণ্ডালদের কাছে যেতাম বলে আপনি আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়েছিলেন, কিন্তু স্যার, চণ্ডাল তো আমরা সবাই। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা চণ্ডালের প্রচ্ছন্ন রূপ লুকিয়ে আছে। লোভ, হিংসা, ক্রোধ এগুলিই হচ্ছে এর বহিঃপ্রকাশ। স্যার আপনি আমাদের জীবন্ত আদর্শ। আপনার কাছ থেকে তো আমরা ত্যাগ আর ক্ষমার আদর্শই শিক্ষা নেবো। আপনি ওকে ক্ষমা করুন স্যার।'

শেষের দিকে সুনন্তর গলা ধরে এলো। তিন দিন পরে মারা গেল সুনন্ত।

চুলের কার্পেট

চুল দিয়ে তৈরী একটা মাঝারি আকারের কার্পেট করতে লাগে প্রায় সাড়ে সাত সের চুল। একজন মানুষের মাথা থেকে এই পরিমাণ চুল পেতে সময় লাগে সত্তর বছর।

ছাত্রবন্ধু বিদ্যাসাগর

প্রণবকুমার পাল

সালটা ছিল ১৮৭৮। জলধর সেন নামে একটি ছাত্র কুমারটুলি স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করলেন দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে। পড়বার খুব ইচ্ছা, কিন্তু দশ টাকাতে তো চলবে না, আরও কিছু চাই। অন্য উপায় না পেয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। তখন বিদ্যাসাগর বাদুড়বাগানের বাড়িতে ছিলেন।

ভয়ও করছিল এমন নামকরা লোকের সামনে যেতে। তার ওপর পরনে ময়লা জামা কাপড়। ডিসেম্বরে রেজাল্ট বেরিয়েছে—আর কলেজে ঢুকতে এসেছেন এপ্রিল মাসে। এর জন্যও ভয় ছিল।

যাই হোক বিদ্যাসাগর ডাকলেন ছেলেটিকে। আড়ষ্ট ভাবে ছেলেটি ঢুকে প্রণাম করলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন—"কিরে, কি চাস?"

উত্তরে ছেলেটি বললেন—"কলেজে পড়তে চাই।"

নানান প্রশ্নের পর যখন জানতে পারলেন জলধর সেন সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করে দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছেন, তখন বিদ্যাসাগর খুশী হয়ে বললেন, "অ্যাঁ এইটুকু ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছিস? বাড়ি কোথায় তোর?" পাংশায় জামাই সূর্যকুমার অধিকারীর বাড়ির কাছেই ছেলেটির বাড়ি শুনে আরও যেন খুশী হলেন তিনি।

বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। কোনরকমে দিন চলে। বিদ্যাসাগর সব শুনে বললেন, "আমার কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে তো সিট খালি নেই, দেখি কি করা যায়।"

জামাই সূর্যকুমারকে সব বললেন। কিন্তু কিছু করা গেল না। তখন বললেন, 'এ বছর কোনমতে হবে না আমার কলেজে। তবে তুই এক কাজ কর। জেনারেল এসেমব্লি কলেজে এবার কম ছাত্র ভর্তি হয়েছে শুনেছি। দেখদেখি সেখানে কোন

—"কাল সকালে দেখা করিস, সব ব্যবস্থা হবে।

সুরাহা হয় কিনা। তা ছাড়া তারা স্কলারশিপ পাওয়া স্টুডেণ্টদের কাছে পাঁচ টাকা মাইনের জায়গায় এক টাকা নেয়। একটা বছর কোনমতে কাটিয়ে ফের আসিস, আমি সেকেণ্ড ইয়ারে ভর্তি করে নেব আসছে বছর।"

সব শুনেও জলধর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণ ঐ টাকাও যোগাড় করা অসম্ভব।

বিদ্যাসাগর বুঝলেন। বললেন, "এ বছর ওখানকার কলেজে ভর্তি হলেও সে মাইনে আমিই দেবো। যা, আজই ভর্তি হয়ে আয়। কাল সকালে দেখা করিস, সব ব্যবস্থা হবে।"

জলধরের চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। বিদ্যাসাগরও কেঁদে ফেললেন। বললেন, "ওরে, দারিদ্র্য অপরাধ নয়, গরীবকে হেয় ভাবতে নেই। ওরে পাগলা, এককালে আমিও তোর মত গরীব ছিলাম। সে সব দিনের কথা জীবনে ভুলব না। যা, কাল আসিস।"

পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত সাহিত্যিক-রূপে

পরিচিত হলেন জলধর সেন। ছাত্রদের জন্য বিদ্যাসাগর যতটুকু পেরেছেন সাহায্য করে গেছেন।

* * *

আর একজন ছাত্রের কথা বলি, যিনি বিদ্যাসাগরের সাহায্যে ও চেষ্টাতেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

১৮৬৫ সালে এফ. এ. পাস করলেন ছেলেটি। টিউশনি করে বি. এ. পড়ছিল। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে তেমন সাহায্য নেই। ঠিক-মত খাওয়া তো চাই। গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করার সময় ছেলেটির চোখের জলে বিদ্যাসাগরের পায়ের পাতা ভিজে গেল। তাঁরও চোখে জল। ছেলেটির দুঃখের কথা সমস্তই জানলেন। তখনই কাগজে কি লিখে ছেলেটির হাতে দিয়ে কলেজের কেরানীর হাতে দিতে বললেন। কেরানীটি বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে চল্লিশটি টাকা ছেলেটির হাতে দিলেন দারুণ বিপদে উদ্ধার পেলেন ছেলেটি।

ছেলেটির নাম নবীনচন্দ্র সেন। একদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবার একজন সাহিত্যিক। রৈবতক, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র কাব্যগ্রন্থ ইনি লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থ "পলাশীর যুদ্ধ" বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছেন।

কোন ছাত্র বই কিনতে পারছেন না, টাকার অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারছেন না, বা অন্য কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদেরই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে তিনি কেঁদেও ফেলেছেন দুঃখের কথা শুনতে শুনতে।

বিদ্যাসাগর যে একজন ছাত্রবন্ধু ছিলেন তা জলধর সেন ও নবীনচন্দ্র সেনের লেখা থেকেই জানতে পারা যায়।

খবর বলছি

একটা বিরাট আনন্দের খবর

শ্রীমধুসূদন দেবের

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য **ছাত্র সুহৃদ** [দ্বিতীয় ভাগ]

শীঘ্রই বের হচ্ছে—

এতে কি থাকছে জান ?

॥ ১ ॥ ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নোত্তর

॥ ২ ॥ সব প্রশ্ন নতুন সিলেবাসের নতুন ধাঁচের প্রশ্ন—বড় প্রশ্ন, ছোট প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, বিষয়মুখী প্রশ্ন ইত্যাদি উত্তর সহ।

॥ ৩ ॥ মৌখিক প্রশ্নও থাকছে।

॥ ৪ ॥ এমন কি কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার নির্দেশও থাকছে।

॥ ৫ ॥ মধ্য-ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন ও উত্তর থাকবে।

এক কথায় জোর গলায় বলা যায় এই বই যার কাছে থাকবে তার—
পরীক্ষায় মোটেই ভয় থাকছে না,
প্রশ্ন যতই শক্ত হোক না।

দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

নতুন ধাঁধা

১। আমার সাথে গল্প শুরু
আমার ডাকে দিনের শুরু।
—উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া, বাঁকুড়া।

২। পা নয়কো মা সাথী
মা-কে ছেড়ে জলে ভাসি।
—অপূর্ব সেন, মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

৩। পাদদেশে বাস তবু
মস্তকে আকাশ
পুচ্ছ কাটি' চালে দিই
করিনু প্রকাশ।
—দুর্গা চ্যাটার্জী, সান্তালদি, পুরুলিয়া।

গত বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। নিবাস ২। কসম ৩। গাজন

গত বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—দীনু, শীলা, হাসি, খুকু ও তাপস—বকুল বাগান রোড; নন্দিনী, শ্রবণা, উর্বশী, সৌগত ও পারমিতা গুপ্ত—নাকতলা; সুবলমামা, মিঠু, বুবু, শম্পা, বাপি ও তোতা—কাঁকুলিয়া রোড; গদাই, ফুচি, বাবু ও বুটি—পর্ণশ্রী পল্লী; খুকু, রাণু, বাপী ও চুয়া—বামণপাড়া লেন; বাবলি, কাকলি ও সোনালী রাহা—পূর্ব সিঁথি রোড; তানা, মিষ্টু ও টুবলুন—পূর্ব সিঁথি রোড; সুজয়, জয়ন্তী ও অতীশ বেতাল—নবীন ঘোষাল রোড; রণবীর, অভিজিৎ, সাধনা ও নির্মল—রামগড়; দীপান্বিতা, সোমা, দোলনচাঁপা ও শান্তনু—পশ্চিম বড়িষা; বাবা, মা, অলক ও সুমিতা—লেক গার্ডেনস্; নন্দদুলাল ও প্রদোষকুমার দাস—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন; শুক্লা, শুভ্রা, অসীম, অমিত ও অভিজিৎ ব্যানার্জী—শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন; মনুয়া, ছোটন, সোনামণি, শঙ্খ, মা ও বাবা—গোবরা রোড; অরুণাভ, তির্যক ও অসীম—কলিকাতা-৪; রাজা, জয়, শুভা চৈতি ও মঞ্জু—চারু অ্যাভেনিউ; শুভ্রা, মানস, রাণা, রুণু ও জেঠু—হালদারপাড়া রোড; মদনমোহন ও ভারতী সরকার—কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট; আলোকরঞ্জন সরকার—পাটোয়ার বাগান লেন; প্রভঞ্জন, সত্য ও হেমন্ত সরকার—পাটোয়ার-বাগান লেন; অনিমা সরকার—পটলডাঙ্গা স্ট্রীট; জ্যোৎস্না, আলোদা, অনু, বড়দা ও বৌদি—কানাইধর লেন; অমিত, অতীন ও অজন্তা রায়চৌধুরী—পূর্ব সিঁথি রোড; শৌর্যশেখর দেব—রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড; পার্থ, সৌমিত্র, শান্তনু ও ফুলকাকু—কলিকাতা।

২৪ পরগনা—শিশুকল্যাণ সমিতির সভ্যবৃন্দ—গোতলাহাট কৃষ্ণপুর; কল্লোল সঞ্জয়, কাকলি, পল্লব ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; কৃষ্ণা, কাবেরী, বাচ্চি মিঠু ও টুলু ঘোষ—উদয়রামপুর; সুধী, সজিতা, দীপু ও তপু চক্রবর্তী—গোতলাহাট কৃষ্ণপুর; রিন্টু, বাচ্চু, ভাইটি, ভাইয়া ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; ঝুনু, জয়, পিউ ও মৌ—ভাটপাড়া; বাবুয়া, মিলু, পটলা মা ও বাবা—গোপালপুর; শাহজাহান উদ্দিন আমেদ—রাজারহাট; রূপক ও পুষ্পকরঞ্জন রায়—বজবজ; টুকুন, অরুণ, রুপু, মিন্টু, মা ও সুধীর ভট্টাচার্য—বারাকপুর; শান্তিময় হাজারী ও অসিতবরণ পাল—আমতলা।

হাওড়া—প্রতাপ লাহা, চিত্ত সোম ও অপর্ণা জানা—ইছাপুর; ইন্দ্রনীল, নভোনীল, বাবা, মা ও পুপু—শিবপুর রোড; অলক, সুভাষ, শৈলেন, তুষার ও অমর—হাওড়া; দোলা, রাজা, তনু, কাকলী ও বাবুয়া—কৃষ্ণধন কর লেন।

হুগলী—কুমু, চুমু, প্রিয়ব্রত ও রাণীব্রত চক্রবর্তী—ভদ্রকালী ; শুভ্রা দাস—চন্দননগর ; সীমা ও সঙ্কিতা বসু—বৈদ্যবাটী ; অরূপ, অনুপ, বাচ্চু অলক ও খোকন—চুঁচুড়া ; রণজিৎ, গোবিন্দ ও শক্তিপদ—সিঙ্গুর ; মিলিবৌদি, কৃষ্ণা, কাবেরী, সুতপা প্রভৃতি—চুঁচুড়া ; টুলটুল, বুলবুল, শ্যামল প্রভৃতি—জনাই ; নীতা, কবিতা, সুজাতা, নিবেদিতা প্রভৃতি—বৈদ্যবাটী।

বর্ধমান—রীণা, বৃত্তি ও ডি. পি. সেণ্টারের কর্মীবৃন্দ—আসানসোল ; দোদুলকুমার রায়—কামারপাড়া ; দীপককুমার চট্টরাজ, জ্যোতিপ্রকাশ মজুমদার, তপন রায়, গৌতম ভট্টাচার্য প্রভৃতি—এ. ভি. বি. কলোনী ; শ্রীতম, চন্দন, সজল ও কাজল কুশারী—বার্নপুর ; আসরফ, নুরুন্নেশা, শান্তি প্রভৃতি—কৃষ্ণরামপুর ; সন্তদাস বটব্যাল—আসানসোল ; তিমিরজ্যোতি, মল্লিকা, দেবজ্যোতি ও মঞ্জরী—কেঁন্দুর ; অরূপ, প্রণব, মিতা ও সলিল বসাক—বার্নপুর ; সুকুমার, গোপাল ও সুপ্রিয়া—বার্নপুর ; বাবা, সেজমামা ও গৌতম ভাণ্ডারী—কামারপাড়া ; মা, বাবা, নীলাঞ্জনা ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান ; মুকুল, অশ্বিনী, দেবাশীষ, দীপালি, বিশ্বজিৎ ও নন্দরাণী দত্ত—সুন্দরচক ; শিখা, বাপ্পা, মিতুন ও অমিয় লাই—এ. ভি. বি. কলোনী ; ছোড়দা, অপু ও কাকলি—হীরাপুর ; লিজা, বাবলিদি, বোন, কাকা প্রভৃতি—কাটোয়া ; নিরুপমা, রীণা, মীনা, কৃষ্ণা ও উত্তম নাগ—বাহাদুরপুর ; প্রদীপ, দিলীপ ও দীপক নাথ—চিত্তরঞ্জন ; মুকুল, রণজিত, বীথি, কণি, সোমা ও লিপি—বোলকুণ্ডু ; প্রতিমা ও বহ্নিশিখা নাথ—চিত্তরঞ্জন ; অসিত, অসীম, ফাল্গুনী, কণা, কৃষ্ণা ও কাবেরী—ইসমাইল ; দিঘারী সব পেয়েছির আসরের ভাইবোন ও কর্মীবৃন্দ—ছোট দিঘারী ; বটু, সুবাস ও শানু—সাঁকো ; কৌস্তুভ, সুচরিতা, সুস্মিতা, প্রতীপ প্রভৃতি—কানাই নাটশাল ; প্রকাশ চন্দ্রশেখর, বিশ্বনাথ, বুম্বা ও ভোলানাথ—বার্নপুর ; মৃণাল, মা, বাবা, মিহির, সুমা, রুমা প্রভৃতি—আসানসোল ; নিশিকান্ত, তুষারকান্ত, অনুপম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি—বনপাস ; বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ ও প্রসেনজিৎ চৌধুরী—আসানসোল ; মাধবী, তৃপ্তি, পূরবী ও দীপা—বার্নপুর ; ছবি, কালু, লুলু ও ভুলু সেন—চিত্তরঞ্জন ; মুন, মৌসুমী, বণ্টুস, বাবুই প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর ; বৌদি, দাদা, দিলীপ, শেখর, মধুমিতা ও সুবল রায়—ছোট দিঘারী।

মেদিনীপুর—কৃষ্ণা, শুক্লা, সোমা, বুড়ো প্রভৃতি—ক্ষীরপাই ; জগগু, ভগগু, চন্দন, রুদ্র প্রভৃতি—মহিষাদল ; রুবী, মঞ্জু, পিউ ও এলসা মিত্র—মেদিনীপুর ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয়, দুলালমামা—গড়বেতা ; জগন, রুমা, টিনা, চন্দন প্রভৃতি—মহিষাদল।

পুরুলিয়া—বাবা, মা, ঘোতন, তোতন প্রভৃতি—নীলকুঠীডাঙ্গা ; পার্থপ্রতিম, দীপ্তিমান ও অংশুমান মাজী—ঝাঁপড়া ; বড়ন, ছোটন, দাদা, বৌদি প্রভৃতি—রঘুনাথপুর ; কাকলী, রাজা, ফুলমনা ও বেশাখী চৌধুরী—নীলকুঠীডাঙ্গা ; স্বপন, টিটো, সুনীল, বাবুয়া প্রভৃতি—মানবাজার ; দিলীপকুমার চৌধুরী—মধুপুর ; স্ব, মহা, ধী ও শ্রীরাজ চৌধুরী—মধুপুর স্বপন, সনাতন, ধ্রুবলাল, কাজল প্রভৃতি—মোহুলকোকা ; অনু, মিতু ও ববি—সান্তালদি ; মলিনা চৌধুরী—মানবাজার ; মুক্তি, বাবুল, লীলা, নীলা ও পাপা—মধুপুর ; পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা ও শক্তিপদ চক্রবর্তী—ছড়রা ; অমনি, পুটলি, মোম, সারদা, টুবলু ও টুপু—সান্তালদি ; গোকুল, নিমাই, সরমা, কল্যাণী, কৃপাসিন্ধু ও সুষমা—হেটগুগুই ; ত্রিদিব, সন্দীপ, প্রদীপ, চৈতালী প্রভৃতি—মধুপুর ; শীতলপ্রসাদ বটব্যাল—অলঙ্গিডাঙ্গা ; বড়দা, অমিয়, হীরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ হাজরা—ছড়রা ; মানা, পিকা, বাপী, বড়মামা ও তৃপ্তি ঘটক—অলঙ্গিডাঙ্গা।

বাঁকুড়া—বাচ্চু ববি, বিণ্টু, মা ও বাবা—লালবাজার ; মানিক, অসিত, বিদ্যুৎ ও গুরুপদ আচার্য—সোনামুখী ; প্রদীপকুমার কর্মকার—দেওরিয়া ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু প্রভৃতি—মটুকবনী ; সীমা, সন্দীপ, অলক, সাধন ও কল্যাণী—লালবাজার ; সুকুমার চক্রবর্তী—চাঁচর ; সুনীল ও সলিল চক্রবর্তী—চাঁচর ; দিদিমা, বৈদ্যনাথ, সোমনাথ ও রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ রায়—বিষ্ণুপুর ; আশামুকুল ও বেলা রায়—বিষ্ণুপুর ; মা, মীরা ও জগন্নাথ রায়—উখরাডিহি ; ধানু, বিশে, গণেশ, তপন প্রভৃতি—সোনামুখী ; গৌর, বসন, আলপনা, হাসি প্রভৃতি—সোনামুখী ; রাউতোড়া সুভাষ সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ—রাউতোড়া ; সত্যনারায়ণ, শুভাশীষ ও আশীষ গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; মাস্টারমশাই, অনিতা ও অশোক দাস—সোনামুখী ; সীমন্ত, হেমন্ত, অনাথ ও নিখিল মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়—মটুকবনী ; গায়ত্রী, অর্চনা, মঞ্জু, আনন্দ প্রভৃতি কোতুলপুর ; চন্দন, মুক্তি ও নিবাস—রাউতোড়া ; অমিয়, সাধন ও স্বপন চট্টোপাধ্যায়—রাউতোড়া ; অমিয়, বিকাশ, নায়ক ও সতীশ ধীবর—রাউতোড়া ; শান্তিসাধন মুখোপাধ্যায়—সোনামুখী ; বাবু, বেলু, তপন, বকুল প্রভৃতি—সোনামুখী ; উত্তমকুমার বটব্যাল—মেইন মেডিক্যাল হোস্টেল ; মা বাবা, শীতল, সমীর ও মলয় বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; রূপালী শিউলী, মৌসুমী, প্রদীপ প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; মা, দাদা, বৌদি দ্বিজদাস প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; সৌম্যেন্দ্র, সৌমিত্র ও শিলাদিত্য—বাঁকুড়া ; সরোজ, কল্যাণ, সুকুমার, অনুপমা সিংহ প্রভৃতি—ভৈরবপুর ; শিবব্রত, লীলা, মীরা ও মীনা—মাণ্ডি ; সোনু, সন্দীপ, সন্তু, মুনু প্রভৃতি—রবীন্দ্র সরণি ; মুকুল, বকুল, অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও বিশ্বদেব বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; স্বরাজ, বিকাশ, তপন, প্রদীপ ও বিশ্বজিৎ দে—সোনামুখী ; দেবাশীষ, সুজাতা, দেবকল্যাণ, শুক্লা ও দেবব্রত বটব্যাল ; সঞ্জীব, রঞ্জীব, বাপ্পা, পম্পা ও শম্পা রায়চৌধুরী—চকবাজার ; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী—সোনামুখী ; মা, বাবা, মাণিক, বিদ্যুৎ ও পার্বতীচরণ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; সোনাবৌদি, উত্তম, শম্পা, শঙ্কু ও ঝন্টু বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; মা, বাবা, বিজয়া, লক্ষ্মী, ভারতী প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; শৈলেন, দিলীপ, কল্যাণ, তুষার ও লাটু মহারাজ—ভৈরবপুর ; টুটু, টুম্পা, নানা ও শান্তি—লোকপুর।

বীরভূম—বাপি, মণি, টুটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—সিউড়ি ; কাঞ্চন সিনহা—আমোদপুর ; মা, বাপী, সৌমিত্র, শিখা, অনুরাধা ও আশীষকুমার ভৌমিক—দুবরাজপুর ; অজিত, গায়ত্রী, মিঠু, মিতা, মানু প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; আলপনা, সঞ্জয়, রাজেশ, কল্পনা ও চন্দনা—বোলপুর ; প্রকাশ, বিকাশ, মলয়, রঞ্জা প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; কথাকলি ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য—দুবরাজপুর।

মেদিনীপুর—গায়ত্রী, প্রীতম, পার্থ, কৌশিক, তীর্থ ও চুমকী—মেদিনীপুর ; শিখা, বিচ্ছু, বুড়ি, মিতা, বাবু প্রভৃতি—ঝাড়গ্রাম ; রাজা, সাথী, স্বপন, মিহির প্রভৃতি—মাতকাতপুর।

মালদহ—কল্লোল ও মহুয়া সোম—হরিশ্চন্দ্রপুর।

দার্জিলিং—সুশান্ত, সুনন্দ, সুমন্ত ও সুকান্ত চক্রবর্তী—শিলিগুড়ি ; খোকন, অমল, শান্তি ও মিলন—শিলিগুড়ি ; শান্তিরঞ্জন রায় ও দুলাল সুর চৌধুরী—শিলিগুড়ি ; রুমি, বাপ্পা, দুলু ও বাচ্চু—শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি—তপন, স্বপন ও রীণা নাগ—বামনডাঙ্গা চা বাগান।

বিহার—শিবপ্রসাদ রায়—তার কোম্পানী ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনীতা, সুনীতা ও অর্ণব পাণ্ডে—সাকচী ; পরেশ, সুখময়, জীমূতবাহন ও প্রণতি বক্সী—বাসদেওপুর কলিয়ারী ; বাপী, বুলু, বাচ্চু লিলি, মিঠু

(৩৯৯ পৃষ্ঠায় দেখ)

আনন্দ আর ধরে না

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিল্টু মন্টুদের আনন্দ আর ধরে না। আজকাল বেশ খেলা টেলা দেখতে পাচ্ছে। ইংলণ্ড থেকে ক্রুকটাউন দল কলকাতায় খেলতে এসেছিল। খেলা দেখতে যাবার জন্যে ওরা উশখুশ করছিল। কিন্তু ভরসা পাচ্ছিল না জিজ্ঞেস করার। যা গরম, যা রোদ! সেজদাদু নির্ঘাত না করে দেবেন। মা বলবেন, এখন খেলা দেখতে গেলে গরম লেগে যাবে। অথচ খেলা দেখার জন্যে ওরা ছটফট করছে।

সেজদাদু তখন নিজেই বললেন, যাও তোমরা, খেলা দেখে এস। ইংলণ্ডের দল। ওরা বিশ্বকাপও পেয়েছে। ওদের খেলার ধরনই আলাদা। দেখলে শিখতে পারবে। চন্দন কাকু তো 'রেডিই' ছিল। মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে ক্রুকটাউনের খেলা। টিকিট পেতে তাই মুশকিলই হল না। বিল্টু-মন্টু, ভোম্বল, ববি, তিলু, নীলু সকলে চন্দন কাকুর সঙ্গে খেলা দেখতে গেল ইডেনে।

খেলা দেখে ফিরে এসে ওরা তো হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই নাকি দারুণ খেলা! ওদের কাছ থেকে আবার কি শিখবে? আমাদের মতোই খেলে ওরা। শুধু ওদের দারুণ সব চেহারা, গায়ের জোর খুব। আর কখনো বল পায়ে রাখে না। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন খেলোয়াড়কে দিয়ে দেয়।

ওদিকে লীগের খেলাও শুরু হয়ে গেছে। এখন তো গরমের ছুটি। সেজদাদুকে বলে চন্দন কাকুর সঙ্গে দু' একদিন মাঠে যেতেই হবে। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইন যা হয়েছে না—চাবুক! উলঙ্গনাথন, সুভাষ ভৌমিক, হাবিব আর আকবর। নির্ঘাৎ এবার দারুণ খেলবে মোহনবাগান। নন্টে-ভন্টেরাও চুপ করে নেই। ওরাই বা ছেড়ে কথা কইবে কেন! কম যায় না তো ইস্টবেঙ্গলও। সত্যি সুরজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা, রণজিৎ মুখার্জী, শুভঙ্কর সান্যাল, আর নতুন যারা এসেছে তারাই বা কম কিসে! তারা ওপর পর পর ছ'বছর লীগ আর চার বছর আই. এফ. এ. শীল্ড জিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তো রেকর্ড করেছে। আর মোহনবাগান বছরের পর বছর হেরে চলেছে। তাই এবার দু' প্রধানের মধ্যে দারুণ লড়াই হবে। মোহনবাগান চাইবে এতোদিনের সব হেরে-টেরে যাওয়ার শোধ তুলতে, আর ইস্টবেঙ্গল চাইবে তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। তাই বিল্টু-মন্টুরা আর ভন্টে-নন্টেরা দিন গুনছে—লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এবার দেখতে দেখতে এসে যাবে সেইদিন—কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান—মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের লড়াইয়ের দিন। আর এ কথাও ঠিক, ঐ খেলায় যে জিতবে সেই হবে এ বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান। সেজদাদু কিন্তু সে খেলা দেখতে বিল্টু-মন্টুদের কিছুতেই যেতে দেবেন না—যা ভিড়! ঐ ভিড়ে খেলা দেখতে যেতে হবে না। বাড়িতে বসে রীলে শুনতে হবে। অথচ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা ওরা কোনদিনই দেখেনি। দেখার জন্যে ওদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মা বলে দিয়েছেন, বড় হও, তারপর মাঠে যাবে। তাই ওদের বড্ড দুঃখ। কেন যে ওরা তাড়াতাড়ি চন্দনকাকুদের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে না!

বিল্টু-মন্টুদের যে দিদি দারুণ ক্রিকেট খেলে, বাংলার হয়ে খেলেছে, টেস্টেও এবার নাকি

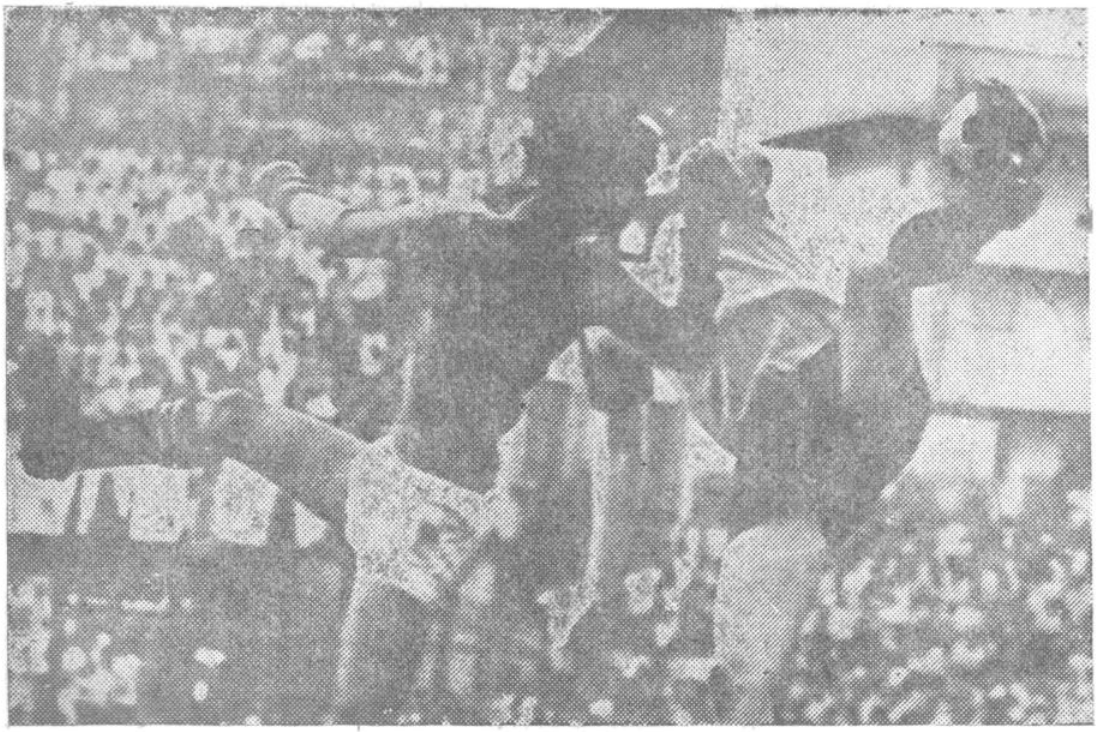

ইংলণ্ডের ক্রুক টাউন ফুটবল দল কলকতায় আর দার্জিলিংয়ে খেলে গেলো। ছবিটি ক্রুক টাউনের সঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলার। ক্রুক টাউনের সিনক্লেয়ার গোল করছেন। তাঁকে আটকাতে পারলেন না মহামেডানের গোলরক্ষক আমেদ কয়া।

খেলবে—সেই রাঙাদি সেদিন বিল্টুকে জিজ্ঞেস করল, বল তো, ক্রুকটাউন ক'টা ম্যাচ খেলেছে? ক'টাতে জিতেছে, ক'টাতে হেরেছে?"

এ আবার একটা প্রশ্ন নাকি? বিল্টু গড়গড় করে বলে গেল—ক্রুকটাউন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ৫—১ গোলে জিতেছে, আর হেরেছে ১—০ গোলে আই. এফ. এ.র কাছে। বাকী খেলাগুলো মানে, মোহনবাগানের সঙ্গে দুটো (একটা কলকাতা আর একটা দার্জিলিংয়ে) ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আর মুখ্যমন্ত্রী একাদশের সঙ্গে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ক্রুকটাউনের সঙ্গে ববি চার্লটনের আসার কথা ছিল। চার্লটন দারুণ নামকরা খেলোয়াড়। এক ডাকে সকলে তাঁকে চেনে। ইংলণ্ডের পক্ষে অনেকদিন তিনি খেলেছেন। খেলেছেন বিশ্বকাপেও। কিন্তু পায়ে চোট লাগায় জন্যে আসতে পারেননি। ইংলণ্ডের বিশ্বকাপ দলের আর একজন খেলোয়াড় টেরি পেন ক্রুকটাউনের হয়ে শেষ খেলাটিতে মাঠে নেমেছিলেন। পেন ইংলণ্ডের হয়ে বিশ্বকাপে খেলেছেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি খেলা দেখাতে পারেননি। তবে তাঁর বল ধরা, পাস দেওয়া, কর্ণার করা প্রভৃতি দেখলে বেশ বোঝা যায়, এককালে পেন দারুণ খেলতেন। তা তো খেলতেনই! তা না হলে কি আর ইংলণ্ড দলে চান্স পাওয়া যায়? সেবার তো আবার ইংলণ্ডই বিশ্বকাপ লাভ করেছিলেন।

গল্প হলেও সত্যি

বাড়িতে আর কেউ নেই। মা রান্না চড়িয়েছেন। রান্নাঘর থেকে বেরুতেই পারছেন না, পাছে সব পুড়ে যায়। এক্ষুণি বাজারে যাবার দরকার। তরকারি-টরকারি কিছু নেই। কাকে পাঠাবেন। ছোট্ট ছেলেটিকে পাঠাতে মন চায় না। অতো ছোট, ও কি বাজারে গিয়ে সব কিনে-টিনে আনতে পারবে? গোলমাল করে ফেলবে না তো?

উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট ছেলেটিকেই বাজারে পাঠাতে হল। খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন কি কি আনতে হবে। হিসেব করে পয়সা দিলেন। হাতে থলে নিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে পড়ল। আনন্দ ওর আর ধরে না। ও তো এইসবই চায়। বাড়ির মধ্যে সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে কি আর ভালো লাগে! আর বাজার তো সে চেনে। কতোবার দাদা-দিদিদের সঙ্গে, মার সঙ্গে গেছে। ঠিক সব কিছু কিনে-টিনে আনতে পারবে। বয়েস তো তার মোটেই কম নয়, সাত পুরে আটে পড়েছে। তবে···!

বাজারে গিয়ে মা যা যা বলে দিয়েছিলেন সব কিনে-টিনে হাতে থলে ঝুলিয়ে বড়দের মতো করে ছেলেটি বাড়ি ফিরে আসছিল। ভাবছিল, বাড়ি গিয়ে মাকে কি অবাকই না করে দেবে! কিছু পয়সাও যে আবার ফিরেছে!

ওদের বাড়ির কাছের ছোট্ট মাঠটায় তখন দারুণ ফুটবল খেলা হচ্ছে। সবাই ওরই বয়সের খেলোয়াড়। কিন্তু একদিকে একজন কম পড়েছে। ওকে দেখেই সকলে চেঁচিয়ে উঠল, "এই খেলবি?"

নিশ্চয়ই। খেলবে না মানে! বাজারের থলেটা একপাশে রেখে নেমে পড়ল মাঠে। মনেই হল না যে বাড়িতে মা তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। বাজার নিয়ে গেলে তবে রান্নাটান্না-হবে। সব ভুলে খেলতে নেমে গেল সে। তারপর সে যা খেলা না—যেন ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল। ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে চলল।

খেলা যখন শেষ হল, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। ঘেমে নেয়ে, কাদা-টাদা মেখে বাজারের থলে হাতে নিয়ে ছেলেটি বাড়ির পথ ধরল। বাড়িতে মা ততোক্ষণে ভেবে চিন্তে ভয়ে কাঁটা হয়ে আসছেন। আপসোস করছেন, কেন যে অতোটুকু ছেলেকে বাজারে পাঠালেন? কি হল কে জানে? হারিয়ে গেল না তো? ছেলেধরা ধরে নিয়ে যায়নি তো? বাড়িতে কেউ নেই। নিজেও বেরুতে পারছেন না। শুধু ভেবে ভেবে মরছেন।

অনেক বেলায় ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরল ছেলেটি! দেখেই মা বুঝতে পারলেন এতোক্ষণ সে কি করছিল। রাগের চোটে বেদম পেটালেন তাকে। মার খেয়েও ছেলেটি কিন্তু একটুও কাঁদল না।

এই ছেলেটি কে জান? বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় ইউসোবিও। পেলের পরেই তাঁর স্থান।

জেনে রাখো

মাঠের আকার ঃ

ফুটবল খেলার মাঠ কতো বড় হবে তার মাপই বা কি? ফুটবল খেলার মাঠ দৈর্ঘ্যে ১৩০ গজের বেশী ও ১০০ গজের কম হবে না ও প্রস্থে ১০০ গজের বেশী ও ৫০ গজের কম হবে না। আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ ১২০ গজের বেশী ও ১১০ গজের কম ও প্রস্থে ৮০ গজের বেশী ও ৭০ গজের কম হবে না।

গোল ও গোল এলাকা ঃ

খেলার মাঠের দু' পাশে গোল লাইনের দিকে গোল পোস্ট থেকে ৬ গজ সমকোণ করে দুটো

লাইন টানা হবে। মাঠের এই লাইন ৬ গজ পর্যন্ত যাবে এবং গোল লাইনের সমান্তরাল একটি লাইনের সঙ্গে ঐ লাইন দুটিকে যোগ করা হবে! এই জায়গাটাকে বলা হয় গোল এরিয়া।

গোল লাইনের ঠিক মধ্যিখানে কর্ণার ফ্লাগ থেকে সমান দূরত্বে দুটি পোস্ট দিয়ে গোল চিহ্নিত হবে পোস্ট দুটির মধ্যে ব্যাবধান হবে ৮ গজের এবং পোস্ট দুটির মাথায় ক্রস বার দিয়ে যোগ করা হবে। মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচুতে ক্রস বারটি থাকবে। গোল পোস্ট ও ক্রস বার পাঁচ ইঞ্চির বেশী বিস্তার হবে না।

পেনাল্টি সীমানা ঃ

গোল পোস্ট থেকে ১৮ গজ দূরে গোল লাইনের সমকোণ করে দুটি রেখা টানতে হবে। মাঠের মধ্যে ১৮ গজ যাবার পর গোল লাইনের সমান্তরাল একটি রেখা টেনে ঐ দুটি রেখার সঙ্গে যোগ করতে হবে। এই জায়গাটিকে পেনাল্টি এরিয়া বলে। গোল লাইনের ঠিক মধ্যিখান থেকে মাঠের মধ্যে ১২ গজ দূরে পেনাল্টি স্পট চিহ্নিত করতে হবে। এইখান থেকে পেনাল্টি কিক নেওয়া হবে।

কর্ণার সীমানা ঃ

মাঠের চার কোণে, যেখানে গোল লাইন ও টাচ লাইন এসে মিশছে সেইখানে পাঁচ ফুটের কম নয় উচ্চতা বিশিষ্ট পতাকা দণ্ড পুঁততে হবে। আর এই পতাকা দণ্ড থেকে এক গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে খেলার মাঠের মধ্যে একটি সিকি-বৃত্ত আঁকতে হবে। এই জায়গাটিকে কর্ণার সীমানা বলে। এইখান থেকেই কর্ণার করতে হবে।

বৈশাখ সংখ্যার নির্ভুল বাকি উত্তরদাতাদের নাম

ও দিপালী দে—রাঁচি ; দেবীপ্রসাদ, মণিদীপা, বাবা ও মা—সাকচী ; মা, বাবা, দাদা, টুলুবৌদি প্রভৃতি—কাপাসায়া ; বৃষ্টি ও রণো—রাঁচি ; দাদু, দিদা, নুপুর নির্মাল্য, শাশ্বতী ও ঝিমলী—চক্রধরপুর ; শিখা, মিতা, সোমা ও রবি—জামসেদপুর ; মৌসুমী, স্বপন, মিলন, শ্যামল, মা ও বাবা—চাষনালা ; মীরা, টিঙ্কু, মিতা ও খুকু—চক্রধরপুর ; হিমু ও মিনু চন্দ—জামসেদপুর ; শান্তনু, অতনু, সুতনু, সুজাতা প্রভৃতি—কুমারডুবি ; বাপ্পা, বাপী, মানু, ধ্রুব প্রভৃতি—জামসেদপুর-৯ ; মিলি ও পলি—বিষ্টুপুর ; প্রণব, চন্দন ও প্রবীরকুমার শীল—পাটনা-১ ; তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; সনৎদা, বুবুল, টুবুল, শিপ্রা ও কাঞ্চন রায়—চাঁচপটায়ী ; বাবা, মা, দিদা, দাদা, দিদি প্রভৃতি—কদমা ; গোলক, অপু, ভাই, গগন ও চন্দন—তার কোম্পানী ; ত্রিদিব, বাবলী, লাভলী, টাবলী ও মাসীমা—জামসেদপুর ; রেবা, বাণী, ছন্দা, রত্না, রুমা ও রীণা—চিরকুণ্ডা ; লক্ষ্মীদি, তারাদি, কৃষ্ণাদি, মৌ প্রভৃতি—সি. এফ. আর. আই. ; দাদা, বাপি, কন্টুদা, দুলা প্রভৃতি—তার কোম্পানী ; সুময়, শ্রীজয়, সুজয় ও সঞ্জয়কুমার পালিত—পাটনা-১ ; মিঠু, বুড়ো, বিশু, মা ও বাবা—জামসেদপুর-৯ ; সনৎ, স্বপন, জীবন প্রভৃতি—ঝরিয়া ; টোটন, বুবু, বাবু, পিন্টু ও সুজিত চট্টরাজ—জামসেদপুর।

আসাম—দীপ্তি, কল্লোল ও মিতুল—চাবুয়া চা বাগান ; স্বপন, উজ্জ্বল, উৎপল, অরুণ প্রভৃতি—প্যারাগন ক্লাব ; শীলা, লেখা, শোভা, বুড়ু প্রভৃতি—পাণ্ডু ; স্বপন, সুমিত, মালা, অঞ্জু ও আবির সেনগুপ্ত—লিচু ; চাঁদ, মীনা, গৌর ও টনো—পাণ্ডু।

উড়িষ্যা—জ্যোতির্ময় ও বাসন্তী দাস—বাণ্ডামুণ্ডা নিউ কলোনী।

দিল্লী—সুনীল, পুষ্পেন, দ্বিজপদ, রথীন্দ্র ও অমিত—নিউ দিল্লী-১৬।

মধ্যপ্রদেশ—দাদা, বৌদি, ফটিক, বাপী ও বুড়ো—ভিলাই ; গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর ; লিলি, সন্ত, বাপাই, মুসু প্রভৃতি—ধানতোলী।

জামা কাপড়ের আয়ু তো আপনারই হাতে

শুধু বাড়ীতে কাচাই যথেষ্ট নয়
এর জন্য সবচেয়ে আগে দরকার
উচ্চমানের ডিটারজেন্ট পাউডার

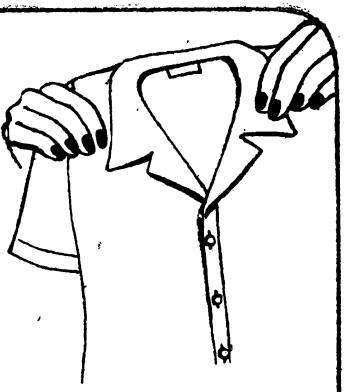

ডিটারজেন্ট পাউডার যদি জলে গরম হয় তবে জানবেন তা আখেরে জামাকাপড় অবশ্যই নষ্ট করবে। নতুন ফরমুলায় তৈরী সিফোম ডিটারজেন্ট পাউডার জলে গরম হয় না। তাই সিফোম জামাকাপড় অনেক বেশী টেকসই করে। তাছাড়া ডিটারজেন্টে ভরপুর নাম মাত্র সিফোম অল্প খরচে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী জামাকাপড়, অনেক বেশী পরিষ্কার ও ঝলমলে করে।

সিফোম

কাপড় বাঁচায় পয়সাও বাঁচায়

র‍্যাপসল ল্যাবরেটরী
১৪৬/৫ লেক গার্ডেনস্ ● কলিকাতা-৪৫

RL-10

সুলেখা কলার বক্সের রং দিয়ে ছবিটি রাঙ্গিয়ে তোল